অসীম দাশগুপ্ত
সুজিত পোদ্দার
স্নেহাস্পদেষু

ভূমিকা

দেখে-শুনে আশঙ্কা হচ্ছে ছায়া পশ্চাৎগামিনী। স্বৈরাচারের যে-লক্ষণগুলি আজ থেকে দশ বছর আগে পরিস্ফুট হয়ে উঠছিল, ১৯৭৭ সালের ঘূর্ণাবর্তে তা, খানিক সময়ের জন্য, চাপা প'ড়ে ছিল। তবে ইতিহাস এরকম প্যাঁচানো রসিকতা মাঝে-মাঝেই করে। ১৯৭৭ সালের জানুয়ারি মাস থেকে, কারণ বলা বাহুল্য, লক্ষণগুলি আবার নতুন ক'রে ফুটে বেরচ্ছে চারদিকে। শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন গোটা দেশে যতদিন সমান শক্তিশালী হয়ে উঠতে না-পারবে, এই পুনরাবৃত্ত আশঙ্কার রেশ ততদিন কাটবার নয়: আমাদের আরও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হবে, দুঃখের মধ্য দিয়ে, তিতিক্ষা ও ত্যাগস্বীকারের মধ্য দিয়ে। দেশের অনেক-অনেক অঞ্চলে মধ্যযুগীয় অন্ধকার দানা বেঁধে আছে, ভয়-ভীতি-কুসংস্কারের সমাচ্ছন্ন ঘাঁটি। রাজার মেয়ে রানী হবে এবং রানীর মেয়ে রাজা হবে, রাজা কিংবা রানী হয়ে তারপর বশংবদ প্রজাদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার-শোষণ চালাবে, এটাই এখনো দেশের বেশির ভাগ জায়গায় স্বতঃসিদ্ধতা। পশ্চিম বাংলায় আমরা যদি অধৈর্য হয়েও উঠি, সে-অধৈর্য অবিমৃষ্যকারিতারই সমার্থক হবে; ইতিহাস যেহেতু ভূগোলকে এড়াতে পারে না, আমাদের আলাদা এগোনো অসম্ভব, ভারতবর্ষের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের অভিযাত্রা।

কিন্তু স্থৈর্য মানে স্থবিরতা নয়। বরং উল্টো, আমাদের প্রতিনিয়ত তদ্গততর হ'তে হবে, নিজেদের বুদ্ধি-বিবেক-বিচারকে শাণিততর ক'রে নিতে হবে। এবং যে-মধ্যযুগীয় শক্তি ইতিহাসের গতিকে আটকে রাখতে চাইছে, তার সম্পর্কে, যুক্তির সংস্থানে দাঁড়িয়েই, ঘৃণা লালন করতে হবে। ঘৃণার চেয়ে পবিত্রতম আবেগ কিছু হ'তে পারে না, আমরা একটা ব্যবস্থার অনাচারকে ঘৃণা করতে শিখি ব'লেই তাকে দীর্ণ করবার প্রেরণা পাই।

আপাতত তাই ঘৃণা স্বৈরাচারের সম্পর্কে, যুদ্ধ স্বৈরাচারের সঙ্গে। গত দশ বছর ধ'রে রচিত, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, নানা আকৃতির যে-প্রবন্ধগুলি এই গ্রন্থে জড়ো করা হলো, তাদের অধিকাংশ জুড়েই এই প্রাসঙ্গিক সমস্যাগুলি আলোচিত-বিশ্লেষিত। বর্তমান মুহূর্তে কী ঘটছে তা বুঝতে গেলে কিয়ৎকাল আগে কী-কী ঘটেছিল জানা প্রয়োজন, এই স্মৃতিরোমন্থন বিলাসিতা নয়। অর্থনীতি ও রাজনীতির পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে সম্পূর্ণ মোহহীন হওয়াও সেই সঙ্গে সমান

প্রয়োজন: প্রথম প্রবন্ধ থেকে শুরু ক'রে সবশেষের নামপ্রবন্ধটি পর্যন্ত এই প্রতীতি উচ্চারিত। লেখাগুলির সব-ক'টির ওজন নিশ্চয়ই সমান নয়। কোথাও-কোথাও লঘু পক্ষের উপর গুরু পক্ষ ভর করেছে, কিন্তু, তা হ'লেও, সব মিলিয়ে, যে-সংকটের মধ্যে আমরা আছি, তার নিকষ পরিচয় খানিকটা হয়তো স্পষ্ট হয়েছে। অবশ্য পাঠকদের বিচারই শেষ কথা বলবে।

প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়েছিল 'দর্পণ', 'জাগৃহি', 'নন্দন', 'মার্কস্‌বাদী পথ', 'দেশহিতৈষী', 'কলকাতা', 'সংগ্রামী হাতিয়ার', 'বারো মাস' ও 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য়। কিছু-কিছু হারিয়ে-যাওয়া রচনা সংগ্রহ করতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন রবি সেনগুপ্ত, হীরেন বসু, মিহির ভট্টাচার্য, সুবীর ভট্টাচার্য, অরুন্ধতী গুহরায় ও অর্চনা গুহ: তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া / ১
শিক্ষা, সমাজ, পরিবেশ / ৭
হরেকৃষ্ণবাবু / ১৭
ছুটো শরৎকালীন চিন্তা / ২০
যে-কোনো একটি নাম / ২৫
আমাদেরই সন্তান-সন্ততি / ২৮
অপরের সুযোগের মতো মনে হয় / ৩২
শিবে গুণ্ডা, শিবে গুণ্ডাই / ৩৫
গরিবগুলি গেল কোথায় / ৩৯
গিয়াছে দেশ / ৪৩
'জরুরি' অবস্থার ভাবনা / ৪৮
মানবতা নিয়ে মাথাব্যথা / ৫২
'ফ্যাসীবাদকে রুখতে হবে' / ৫৫
দেখে শেখা, ঠেকে শেখা / ৫৮
দাম কেন বাড়ে / ৬২
পালাবদলের পরে / ৬৬
যাদের রাজা হবার পালা / ৭০
একটি হতভম্ব কবুলতি / ৭৪
অভিনয়? অভিনয় নয়? / ৮১
দেশকে কী ক'রে বিকোতে হয় / ৮৮
হবেও বা / ১০১
সংকটের স্বরূপ / ১০৫

নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া

গ্রহের ফেরে ধনবিজ্ঞানের বেসাতি ক'রে আমাকে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হয়। ১৯৪৩ সালের পর এত হাহাকার দেশে শোনা যায়নি। দুর্ভিক্ষ, কাতারে-কাতারে লোক মারা যাচ্ছে, কাতারে-কাতারে লোক না খেতে পেয়ে ধুঁকছে। যারা মারা যাচ্ছে, তাদের মুখে রা নেই, তাদের শুধু, কাব্যকে ব্যঙ্গ করে বলতে ইচ্ছা হয়, ভয়চকিত হরিণহরিণীর মতো চোখ। মৃত্যুভয় : কেউ এরা মরতে চায় না, বেঁচে থাকার শখ বড়ো দুর্মর। যারা মারা যাচ্ছে তাদের মুখে রা নেই। কিন্তু, সেইসঙ্গে যাঁরা চিরাচরিত পরিভাষায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত, তাঁরাও ক্রমশ ক্ষীণতরবিত্ত হচ্ছেন, আর্থিক দুর্দশার চাপে হাঁসফাঁস করছেন। হয়তো আর বেশিদিন থাকবে না, তবু, এখনো পর্যন্ত, তাঁদের মুখে রা আছে। অনেকেই তাঁরা ধনবিজ্ঞানীদের শাপ-শাপান্ত করছেন। তাঁরা ধ'রেই নিয়েছেন দেশটা উচ্ছন্নে যাচ্ছে এই হতভাগা ধনবিজ্ঞানীগুলোর অপদার্থতার জন্য, তাঁদের দেওয়া ভুল উপদেশহেতুই দেশের এই পরম দুরবস্থা।

হায়, যদি তা-ই হতো!

ধনবিজ্ঞানীরা অর্থনীতির কার্যকারণসম্পর্ক বিশ্লেষণ করেন, কত ধানে কত চাল হয় ব্যাখ্যা করেন, ডাইনে আনতে গেলে বাঁয়ে যে সত্যিই কুলোনো সম্ভব নয় সেটা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেন। সমাজে এ-সব মৌলিক জ্ঞানের প্রয়োজন আছে, ধনবিজ্ঞানীদের বাদ দিয়ে তাই চলে না। দেশের শ্রীসম্পদ কী ক'রে বাড়ানো যেতে পারে, কোন্-কোন্ প্রকরণ-প্রণালীর সাহায্যে, তা নিয়ে ধন-বিজ্ঞানীরা মস্ত-মস্ত রচনা ফাঁদতে পরমপারঙ্গম। কোন্ সড়ক ধ'রে এগোলে গরিবদের সুখবৃদ্ধি, সম্পন্নদের কম পোয়াবারো, অথবা অন্য কোন্ বিকল্প অবলম্বন করা মানেই সমাজের হতভাগ্যদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা, ধনীদের পরম তৃপ্তি, তা বিশদ ক'রে ধরা পড়ে ধনবিজ্ঞানীদের চিন্তার মুকুরে।

মুস্কিল হলো ধনবিজ্ঞানীরা উপদেশ-পরামর্শ দিয়েই খালাস। মানছি, আমার জীবিকার লোকদের মধ্যেও উত্তম-মধ্যম-অধমের ভেদাভেদ আছে, কেউ-কেউ

ক্ষুরধারবুদ্ধি, কেউ-কেউ গণ্ডমূর্খ, অন্য যে-কোনো শাস্ত্রচর্চার বেলায় যেমন ঠিক তেমনি। কিন্তু সমস্যা সেখানে নয়। সমস্যা আরো গহনে: ধনবিজ্ঞানীদের পরামর্শে দেশটা চলে না, জাতির অর্থনীতির কাঠামো কখনোই ধনবিজ্ঞানীরা স্থির ক'রে দেন না। আমরা ডাইনে যাবো কি বাঁয়ে যাবো, এই শস্যের ফলন বাড়াবো না ঐ তৈজস আরো বেশি করে আমদানি করবো, দেশে দাম বাড়বে কি কমবে, ধনীদের সাচ্ছল্যের দিকে আরো বেশি নজর দেওয়া হবে, না অল্পবিত্ত বা বিত্তহীনদের ঈষৎ একটু সুরাহার কথা ভাবতে হবে, এ-সমস্ত প্রশ্নাবলীর মীমাংসা ধনবিজ্ঞানের আঙিনায় কখনোই হয় না। দেশের অর্থনীতি দেশের রাজনীতিকদের অঙ্গুলিহেলনে চালিত হয়, হচ্ছে, হবে: ধনবিজ্ঞানীরা সুন্দর-সুন্দর প্রবন্ধ রচনা করেন, সে-সব প্রবন্ধের মর্মকথায় কান পাতা হবে কি হবে না, তা স্থির করবেন দেশের রাজনীতির যাঁরা হাল ধরে আছেন তাঁরা। আমরা তো স্রেফ ফড়ে।

এমন না-হয়ে পারে না। রাজনীতি মানে ক্ষমতার লড়াই, রাষ্ট্রশক্তি কারা দখল করবেন তা নিয়ে কামড়াকামড়ি। কিন্তু তোফা সিংহাসনে ব'সে ভালো সাজপোশাকের ঝলক দেখাবো কিংবা সবাই আমাকে অভিবাদন করবে তাতে আমার গায়ে পুলক লাগবে স্রেফ এ-ধরনের বালখিল্য প্রবৃত্তির শিকার হয়ে কেউ রাজনীতিতে নামেন না। রাজনীতিতে সফলতা মানে হাতে ক্ষমতা পাওয়া, রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে পাওয়া মানে সোনার কাঠি - রুপোর কাঠি অর্জন, যে-সোনার কাঠি - রুপোর কাঠির সাহায্যে আমার যাঁরা আশেপাশে আছেন, আমার যাঁরা মিত্র, যাঁরা আমার শ্রেণীভুক্ত, তাঁদের ভূসম্পত্তি আমি হু-হু করে বাড়িয়ে দেবো, তাঁদের জন্য সোনাদানা-মিশ্রী-চানার ব্যবস্থা করবো, তাঁদের দৈনিক-মাসিক-বাৎসরিক উপায় যাতে ক্রমবর্ধমান হয়, সে-ব্যাপারে সদাসচেষ্ট থাকবো। অন্য পক্ষে যারা আমার সঙ্গে নেই, আমার শ্রেণীস্বার্থের যারা বিরোধিতা করে, যাদের সুযোগ-সুবিধা না কমলে আমার শ্রেণীভুক্ত লোকদের সুযোগ-সুবিধা বাড়া মুশকিল, রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তাদের প্রতি পদে ল্যাং মারার চেষ্টা করবো, তাদের গুড়ে বালি ঢালবো, তাদের অনিষ্টই শুধু চিন্তা করব না, সেই অনিষ্ট কী ভাবে ঘটানো সম্ভব, তা নিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবো। আমরা-সবাই-লক্ষ্মী-ছেলে-তোমরা-অতি-বিশ্রী তোমরা-খাবে-নিমের-পাঁচন-আমরা-খাবো-মিশ্রী: এটাই শ্রেণী-সম্পর্কের সারাৎসার। নিজেরা যদি মিশ্রী খেতে চাই, অন্যদের নিমের পাঁচন গেলাতে হবে, অর্থনীতির নিয়ম তাই বলে। রাষ্ট্রক্ষমতার উচ্চ চূড়ায় উত্তীর্ণ

হয়ে কর্তা-ব্যক্তিরা তাই অর্থনীতির ফলিত প্রয়োগে ব্যাপৃত হয়ে পড়েন। অন্যথা রাজ-নীতি অর্থহীন।

একটু বাড়িয়ে বলা হলো কি? মনে হয় না। শুনতে রূঢ় শোনালেও, রাজনীতির আসল চেহারার কোনো রকমফের নেই। অবশ্য একটু রেখে-ঢেকে প্রকাশ্যে কথা বলতে হয়। যেমন পোশাকি বিবরণে ভারতবর্ষ গণতন্ত্র—এখানে মাঝে-মাঝে অবাধ নির্বাচন হয়, সে-নির্বাচনে একুশে-পৌছনো সমস্ত নাগরিক নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করার অধিকারী। দেশের দুই-তৃতীয়াংশ লোক অর্ধভুক্ত-অভুক্ত, আরো বেশ-কয়েক কোটি অতি জীর্ণ পরিবেশে, গভীর অনটনের মধ্যে দিনযাপন করেন। রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে পেতে হ'লে এঁদের ভালো-ভালো কথা ব'লে খুশি রাখা প্রয়োজন; মাঝে-মাঝে আশার বাণী তাই শোনাতে হয়, দু-একটি সহজ টানে ভবিষ্যতের সোনালি ছবি এঁকে এঁদের সামনে তুলে ধরতে হয়, আধো-আধো আদুরে গলায় বলতে হয়: তোমাদের জন্য সব প্রস্তুত। এই চতুরালি রাজনীতির প্রধান সূত্র। যে-কোনো প্রকারে ক্ষমতায় পৌছুতে হবে, ক্ষমতা করতলগত না-হ'লে আমার শ্রেণীর শ্রীবর্ধন সম্ভব নয়। অথচ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নিছক আমার নিজের শ্রেণীর সমর্থনের উপর নির্ভর ক'রে লক্ষ্যভেদ অঙ্কের হিশেবের বাইরে, সুতরাং শাঠ্য শিখতেই হবে আমাকে, অনৃতভাষণে দক্ষ হ'তে হবে, যাদের সর্বনাশ সাধন না-করলে আমার শ্রেণীস্বার্থ ব্যর্থমনস্কাম পুরুষের মতো দাপড়ে ফিরবে, তাদের আপাতত বশীকরণে ভোলাতে হবে।

ভোলানো হয়। মিষ্টি-মিষ্টি কথার বন্যা বয়, কিন্তু কাজ হাসিল হবার পরেই ছিটকে শ্রেণীস্বার্থে প্রত্যাবর্তন। যেমন এই মুহূর্তে আমাদের দেশে গরিবরা হাজারে-হাজারে না-খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে। ১৯৪৩ সালের প্রায়-পুনরাবৃত্তি, মুদ্রাস্ফীতির তাড়নায় এমনকি মধ্যবিত্তকুল পর্যন্ত আস্তিকতায় আস্থা হারাতে উদ্যত, এর কোনো-কিছুই বিশুদ্ধ অর্থনীতির ব্যাপার নয়, রাজনীতির লীলাখেলা। এ-প্রদেশ ও-প্রদেশ সে-প্রদেশ জুড়ে গ্রামে-গ্রামে ভূমিহীন কৃষক-ছোটো চাষীর সম্প্রদায় না-খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে, তার কারণ কিন্তু এটা নয় যে দেশে খাদ্য নেই। বিগত মরশুমে ফসল মোটামুটি ভালোই হয়েছিল: পশ্চিম বাংলায় শোনা গিয়েছিল এত ধান নাকি এর আগে কখনো আবাদ হয় নি। হলে কী হয়, সব-কিছুর উর্ধ্বে যে-শ্রেণী বা শ্রেণীযূথ রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ক'রে আছে, তার স্বার্থ, ধনী চাষী-ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের স্বার্থ। ফসল ভালো হ'লে বাজারে দাম কমবে, দেশের গরিবরা দু'মুঠো অন্ন খেয়ে বাঁচবে। অথচ বাজারে দাম প'ড়ে

গেলে মুনাফায় টান, ধনী চাষীর সর্বনাশ, ব্যবসায়ীদের পক্ষেও মহা ফেরো। সুতরাং, জোট বাঁধো পরামর্শ করো ষড়যন্ত্রে সামিল হও; রাষ্ট্রক্ষমতা কাজে লাগাও, ফসলের দাম বাজারে কমতে দেওয়া চলবে না: ফসল বেশি হয়েছে তাতে কী, দেশের বড়োলোকদের তো ভাতে মারা যায় না। ব্যাঙ্ক থেকে অতএব ধনী চাষী সম্প্রদায় ও ব্যবসায়ীদের জন্য উদার হস্তে লগ্নির ব্যবস্থা করা হয়, সেই লগ্নির সাহায্যে তাঁরা শস্য ধ'রে রাখতে পারেন, বাজারে দাম স্থিত হয়। কৃষি-উন্নয়নের অছিলায় সরকারি খাতে কয়েকশো কোটি টাকা চুঁইয়ে পড়ে, তার সামান্য অংশই অধিক ফলনের উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয়, সে-টাকা সব গিয়ে জড়ো হয় উচ্চবিত্ত চাষীদের আওতায়, ফসল ধ'রে রাখবার সামর্থ্য তাঁদের আরো-একটু বৃদ্ধি পায়। চমৎকার উৎপাদন হয়েছে, সাধারণ লোকের মনে আশা জাগে, এবার দাম একটু কমবে, খেয়ে-প'রে বাঁচবে তারা, কিন্তু সরকার উর্ধ্বশ্বাস উৎসাহে খাদ্যশস্যের ক্রয়মূল্য বাড়িয়ে দেন ঠিক সেই মাহেন্দ্র মুহূর্তেই, ক্রয়মূল্য না-বাড়ালে এই মাগ্‌গি-গণ্ডার বাজারে ভূম্যধিকারীদের নাকি খরচ পোষাবে না, তাঁরা নিরুৎসাহ হয়ে পড়বেন, শস্যোৎপাদনে মন্দা আসবে। এ এক আশ্চর্য উপত্যকায় উপনীত আমরা: ফসল বাড়লেও দাম বাড়ে, ফসল না-বাড়লে তো কথাই নেই। সরকারি ক্রয়মূল্য যেই বাড়ানো হয়, সঙ্গে-সঙ্গে বাজারদরের উপরও তার প্রভাব পড়ে; সরকার নিজেই যেহেতু দাম বাড়িয়ে দিয়েছেন, অন্যেরা কোন্ ছার, এই যুক্তি তখন অখণ্ডনীয় হয়ে দাঁড়ায়। সরকার খাদ্যশস্য আহরণ করেন গরিবদের সস্তা দরে খিদের খাবার পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে, কিন্তু আহরণ-মূল্য চ'ড়ে গেলে সে-উদ্দেশ্যে খণ্ড হতে বাধ্য: চড়া দাম দিয়ে খাদ্যশস্য কেনার মতো সংগতি সমাজের দরিদ্রশ্রেণীর নেহাৎই সীমিত, অন্যথা তারা দরিদ্র থাকতো না। সাধারণ শ্রমিকের মজুরি এক জায়গায় ঠেকে থাকে, যে-হারে মূল্যমান বাড়ে অন্তত তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। ঠিক তেমনি, গ্রামাঞ্চলে কৃষকের উপার্জনও থমকে দাঁড়ানো: অথচ তন্দুল থেকে শুরু ক'রে সব জিনিশপত্রের দাম হু-হু ক'রে উর্ধ্বগতি হয়। সরকারি সূত্রে খাদ্যবণ্টনের কথা বলছিলাম, কিন্তু সামান্য যতটুকু বণ্টনও হয়, তার পুরোটাই প্রায় গঞ্জে-শহরে, গ্রামের গরিবরা মারা পড়ে।

যেহেতু খাদ্যশস্যের দাম বাড়ে, সেইসঙ্গে পাট-তৈলবীজ-কার্পাস ইত্যাদিরও বাড়ে, যেহেতু শস্যের ক্ষেত্রে এক পারস্পরিক অনুকম্পায়ী সম্পর্ক। শিল্পজাত দ্রব্যাদির দামও সেইসঙ্গে বাড়ে, মুদ্রাস্ফীতির নৈরাজ্যে আমরা পৌঁছুই।

ধনী চাষীদের লাভের বহর স্ফীত হয়, ফাটকাবাজ-ব্যবসায়ীদের কপাল খোলে। শিল্পপতিদের খরচের বহর বাড়ে, কিন্তু তাঁরা সেটা পুষিয়ে নেন আনুপাতিক হারেরও বেশি দাম বাড়িয়ে নিয়ে: অতএব মুদ্রাস্ফীতির ফলে দেশের বড়ো-লোকদের সামান্যতম অসুবিধাও হয় না। কয়েকটা দিন গড়িয়ে গেলে ধনী চাষী কিংবা শিল্পপতি সম্প্রদায় সবাই উপলব্ধি করেন, সমস্ত ক্রিয়াকর্মের সারাৎসার লাভের পরিমাণ, ক্রমবিস্ফারমান মুদ্রাস্ফীতির লগ্নে উৎপাদনের প্রসঙ্গ নিয়ে মাথা না-ঘামালেও চলবে, বরঞ্চ উৎপাদন যত সংকুচিত হবে, লোকের ত্রাহি-ত্রাহি ভাব তত বাড়বে, লাভ তত বেশি হবে। উৎপাদন ব্যাহত হ'লে উচ্চবিত্তদের সম্ভোগে ঘাটতি পড়বে না, মারা পড়বে শুধু গরিবরা। উচ্চবিত্তদের উপার্জন বরঞ্চ আরো উচ্ছলগতি হবে: দেশের যাঁরা হাল ধরে আছেন, তাঁরা তো ঠিক তা-ই চান, প্রকাশ্য বিবৃতিতে অন্য যে-কথাই বলুন।

এই অবস্থায় বৃত্তিধারী ব্যক্তিদের জন্য কিছুটা করুণাই হয় আমার: মুদ্রা-স্ফীতি কী-কী উপায়ে রোধ করা যায়, বিনিয়োগ কী ক'রে বাড়ানো সম্ভব, উৎপাদনের ক্ষেত্রে ফের কোন্ পদ্ধতিতে জোয়ার আসতে পারে, এ-সমস্ত গুরু সমস্যা নিয়ে তাঁরা প্রচুর কালাতিপাত করেন, দলিল-দস্তাবেজ তৈরি করেন, প্রধান মন্ত্রীর কাছে আবেদন-নিবেদন পাঠান। নেই কাজ তো খই বাছ। যা ঘটছে তা সরকারের অর্থনীতিতে ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে ব'লে নয়, যা ঘটছে তা রাজনীতির প্রতিফলন, যাঁরা আপাতত রাষ্ট্রক্ষমতার দখলদার, তাঁদের শ্রেণী-স্বার্থহেতুই মুদ্রাস্ফীতি, উৎপাদনহ্রাস, গরিবদের না-খেতে পেয়ে মারা-যাওয়া; রাষ্ট্রক্ষমতার আপাতত যাঁরা দখলদার, তাঁদের অর্থনীতিতে কোনো গলদ নেই, অর্থনীতি তাঁরা ভালোই বোঝেন, তাঁদের পৌষমাস আগত ব'লেই অন্যান্য দেশ-বাসীদের এই সমুৎপন্ন সর্বনাশ।

ধনবিজ্ঞান নিয়ে পণ্ডিতি তর্ক, এরকম অবস্থায়, আমার কাছে অন্তত, বীভৎস রসিকতা। যেখানে শ্রেণীস্বার্থ প্রকট, সেখানে চক্ষুলজ্জার বালাই থাকে না। তাই দেখুন, যারা আমাদের দেশে দুর্দম অবিনয়ের সঙ্গে সর্ববিধ জিনিশপত্রের দাম বাড়িয়ে চলেছে, সরকারের তরফ থেকে তাদের মৃদু তিরস্কার পর্যন্ত করা হচ্ছে না, অন্য পক্ষে মূল্যবৃদ্ধির ফলে যাদের নাভিশ্বাস অবস্থা, শ্রমিকশ্রেণী তথা নিম্নমধ্যবিত্ত কেরানিকুল, তাদের উপার্জন যাতে আরো কমে, সেজন্য কত সম্মিলিত আয়োজন-উপচার। কুড়ি লক্ষ রেল শ্রমিকদের ধর্মঘট ভাঙার জন্য কাঁড়ি-কাঁড়ি সৈন্য-বাহিনী-সান্ত্রী-পুলিশ-সাঁজোয়া গাড়ি চণ্ডাও হয়ে নামে, কিন্তু মাত্র পাঁচ হাজার

ভূম্যধিকারী যখন সরকারকে তাঁদের অঙ্গীকৃত চাল-গম বিক্রি করতে অস্বীকার করেন, রাষ্ট্রশক্তির টিকিও দেখা যায় না। শিবঠাকুরের আপন দেশ এটা।

১৯৪৩ সালের পর এত হাহাকার শোনা যায়নি। গরিবরা কাতারে-কাতারে না-খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে। সরকার অবিচল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্বিধাবিজড়িত অবস্থা। তাঁদের মধ্যে যাঁরা মুদ্রাস্ফীতির সুযোগে কিছুটা আখের গুছিয়ে নিতে পারবেন, তাঁরা কাঁচা পয়সার মুখ দেখবেন, তিরিশ টাকা দাম দিয়ে গল্‌দা চিংড়ি কিনবেন-খাবেন, তাঁদের বিবেকে চিড় ধরবে না। অধিকাংশই এ-ধরনের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন, মূল্যমান বৃদ্ধির চাপে তাই ক্রমশই তাঁরা বিস্ফারিত-জিহ্বা হবেন, তাঁদের জীবনযাত্রায় বিপর্যয়ের ঢল নামবে, আস্তে-আস্তে তাঁরা সমাজের দরিদ্রতম সম্প্রদায়ের কাছাকাছি এগোবেন। অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ হবেন তাঁরা, নতুন প্রজ্ঞাপারমিতায় উত্তীর্ণ হবেন তাঁরা, বুঝতে শিখবেন সমাজের আর্থিক সমস্যাগুলি আসলে শ্রেণীবিভাজনের সমস্যা, অর্থনীতি আসলে রাজ-নীতির ক্রীড়নক মাত্র। আজ তাঁরা প'ড়ে-প'ড়ে মার খাচ্ছেন, দেশের আপামর জনসাধারণ প'ড়ে-প'ড়ে মার খাচ্ছেন, কারণ তাঁদের সংগঠন নেই, সংঘবদ্ধতা নেই, রাজনীতির চালে উপস্থিত তাঁরা তাই হেরো। যদি তাঁরা বাঁচতে চান, স্বাস্থ্যে-উৎসাহেশ্রীলতায় বিকশিত হ'তে চান, তা হ'লে তাঁদের জোট বাঁধতে হবে, জোট বেঁধে রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করার পরিকল্পনাসিদ্ধির দিকে অগ্রসর হতে হবে।

জানি, অনেকেই গাল পাড়বেন, বড়ো বেশি সরলীকরণ হলো, অনেক লম্বা-চওড়া উক্তি এক নিঃশ্বাসে ঢালাও ক'রে ব'লে যাওয়া হলো। কিন্তু, নিজের বিশ্বাসের কথা বলছি, আর্থিক সংকটের মূলসূত্রটি সত্যিই এমন সাদামাটা: সোজা কথা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে ব'লে কী লাভ? দেশ জুড়ে ঘনঘটা, তা সত্ত্বেও যাঁরা চাইছেন ধনবিজ্ঞানীরা হিংটিংছট আউড়ে যান, তাঁদের সাধুতাতেই আমার সন্দেহ। প্রমথ চৌধুরী একবার তাঁর গল্পের ঘোষাল-কে কথা না-বলার আর্ট শিখতে বলেছিলেন। হায়, আমাদের ধনবিজ্ঞানীরাও যদি ঐ পরামর্শটি গ্রহণ করতেন!

শিক্ষা, সমাজ, পরিবেশ

শিক্ষার আদর্শকে যিনি তুঙ্গে তুলে ধরেছিলেন, যিনি ছিলেন আমাদের সকলের কাছে প্রপিতামহপ্রতিম, অর্ধশতাব্দীরও অধিক সময় ধ'রে যিনি যুগপৎ ছাত্র এবং শিক্ষকসমাজকে শিখিয়ে গেছেন যে শিক্ষার চেয়ে মহত্তর বৃত্তি অকল্পনীয়, সেই পরমশ্রদ্ধেয় আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু-কে আমরা কয়েক মাস আগে হারিয়েছি। পরিণত বয়সে তিনি গত হয়েছেন, কিন্তু আমাদের শোকের দায়ভাগ তাতে কমবার নয়। তাঁর জীবনের দৃষ্টান্ত অহরহ স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যে আচার্যের স্থান সমাজের শীর্ষে। রাজারা রাজ্য-শাসন করেছেন, সেনাপতিদের পরামর্শে ভূখণ্ডের অধিকার নিয়ে কামড়াকামড়ি করেছেন, মন্ত্রীরা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন, সদাগর বাণিজ্যে বেরিয়েছেন, কৃষক-শ্রমজীবী-করণিক তাঁদের স্ব-স্ব বৃত্তিতে ব্যাপৃত থেকেছেন, কল্যাণী গৃহবধূ সংসারের শ্রীবৃদ্ধি করেছেন, কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকেই বিনম্রচিত্তে স্বীকার করেছেন তাঁদের সমস্ত শক্তির-সৃষ্টির-কর্মের-প্রতিভার আধার শিক্ষা, দিনের সূচনায় তথা সায়ংকালে তাঁরা আচার্যের কাছে প্রণিপাত হয়েছেন। যিনি গুরু, যিনি আচার্য, সভ্যতার বিকাশ ও প্রগতির সংগোপন সূত্র তাঁর করতলগত। শিক্ষা আমাদের জ্ঞানান্বিত করে, উন্নীত করে, সংস্কৃতিবান করে, সৃষ্টিতে উদ্‌বুদ্ধ করে। শিক্ষার গহনে তাই সভ্যতার অগ্রগতির রহস্য। যদি কখনো এমন হয়, সমাজের কোনো মূঢ় মনে করেন, শিক্ষকদের ভূসম্পত্তি সামান্য, তাঁদের বেশভূষা জীর্ণমলিন, তাঁদের দেহকান্তি ক্ষীয়মান, অতএব তাঁদের তুচ্ছ করলেও চলে, সে-সমাজের অন্তিম দশা ঘনিয়ে এসেছে। যে-সমাজে শিক্ষক অবহেলিত, সে-সমাজ ধ'রে নিয়েছে জ্ঞানের কোনো মূল্য নেই, তার মানে সে-সমাজ মৃত্যুকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সাহিত্য, কলাসৃষ্টি, শিল্পোৎপাদন ইত্যাদির কথা না-হয় ছেড়েই দিলাম, এমনকি শৌর্যও তো আবহমানকাল জ্ঞানের আশ্রয়ী। শিক্ষকদের যাঁরা বাহুল্য মনে করেন, জ্ঞানচর্চা যাঁদের কাছে তুচ্ছাতিতুচ্ছ, তাঁরা তাই জাতীয় ভবিষ্যৎকেই গলা টিপে মারতে চাইছেন।

অথচ, দেখুন, আমাদের দেশ এখন যে-অবস্থায় পৌঁছেছে, তাতে সত্যিই আশঙ্কা হয় শিক্ষার প্রসঙ্গ উৎক্ষিপ্ত, সমাজে শিক্ষক-অধ্যাপকের স্থান অপ্রাসঙ্গিক। মুদ্রাস্ফীতির সুযোগে পরস্বঅপহরণকারীরা ফুলে-ফেঁপে উঠছেন; একটু যাঁরা বিবেকহীন, অপরের খাদ্য-পরিধেয় অন্ধকার গুদোমে ধ'রে রাখবার মতো চতুরালি শিখেছেন, তাঁরা চিক্কণ থেকে চিক্কণতর হচ্ছেন; অন্য দিকে যাঁরা দুর্বল, যাঁরা নীরব, যাঁরা নম্র, অথবা যাঁরা নিজেদের স্বার্থ নিয়ে চেঁচামেচি করাকে অবিনয় ব'লে মনে করেন, তাঁরা ক্ষুধায় কাতর থেকে কাতরতর হচ্ছেন, প্রায় বস্ত্র-রহিত অবস্থায় পৌঁছুচ্ছেন। মানছি, শিক্ষকদের স্বাভাবিক আশ্রয় আশ্রমের নিভৃত প্রকোষ্ঠে, বিদ্যালয়ের অলিন্দে। কিন্তু এটা তো স্বাভাবিক অবস্থা নয়। সমাজ তার স্থৈর্য হারিয়ে ফেলেছে, রাষ্ট্রের মেরুদণ্ডে কোনো-এক করাল ব্যাধি প্রবিষ্ট হয়েছে, মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপে ঐতিহ্যগত মূল্যমান উল্টো-পাল্টা হয়ে গেছে। জীবনানন্দ দাশ হতচকিত দুর্ভাবনায় মন্তব্য ক'রে গিয়েছিলেন: অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ। সত্যিই যেন তাই: যারা অন্ধ, তারাই আজ সবচেয়ে বেশি চোখে দেখার ভান করছে, যাদের হৃদয়ে প্রেম-প্রীতি-করুণার বিন্দুতম আলোড়ন নেই, তারাই হুকুম শানাচ্ছে। সমাজ যদি ব্রাত্য হয়, তাকে ফিরিয়ে আনার দায়িত্বও শিক্ষকসমাজেরই। মুদ্রাস্ফীতির অনাচারে শিক্ষকরা পর্যুদস্ত হলে গোটা শিক্ষাব্যবস্থাই ভেঙে পড়বে, দেশের চরম সর্বনাশ ঘনিয়ে আসবে। সুতরাং শিক্ষকদের মঞ্চ থেকে নেমে এসে মাঝে-মাঝে রাজপথেও যে আন্দোলন করতে হচ্ছে, তাতে সংকোচের কিছু নেই। জাতীয় বিবেককে সচেতন করার আপাতত অন্য উপায় হয়তো নেই, রাস্তাই, একমাত্র না-হ'লেও হয়তো প্রধান, রাস্তা। অতীতে তাঁদের সংহত, ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ফলেই সরকার বেশ কয়েকবার শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থা পর্যালোচনায় স্বীকৃত হয়েছিলেন, অতি সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের জন্য যে-সামান্য উন্নত বেতনক্রমের কথা ঘোষণা করেছেন, তার মূলেও তো আন্দোলন। শিক্ষকরা নানা দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে রাস্তায় নেমেছেন, পরস্পরের হাত ধরেছেন, অন্য রাজ্যের অধ্যাপকদের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে আন্দোলন চালিয়েছেন, সংহতিতেই শক্তি তা নিজেরা উপলব্ধি করেছেন, সরকারকে বোঝাতে পেরেছেন, এ-সমস্তই তো মস্ত গৌরবের ব্যাপার। তাঁদের দাবি অবশ্য এখনো সম্পূর্ণতমভাবে সাম্প্রতিক ঘোষণায় স্বীকৃত হয় নি, এখানে-ওখানে অস্পষ্টতা থেকে গেছে, তা ছাড়া শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের যাঁরা অতিনিকট

সহকর্মী, তাঁদের অনেকেরই সমস্যার আদৌ কোনো নিরসন হয় নি, আন্দোলনের ধারা তাই অব্যাহত রাখতেই হবে, এই চিন্তাতেও অতএব জড়তার কোনো স্থান নেই।

যদি ধ'রেও নেওয়া যায়, আমাদের সব সহকর্মীদের জন্য বর্ধিত বেতনহার সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হলো, বৃত্তিগত নিরাপত্তা ইত্যাদি নানা ব্যাপারেও মোটা-মুটি সন্তোষজনক একটা মীমাংসা হলো, তা হ'লেও কিছু-কিছু সামগ্রিক সমস্যা থেকেই যায়। মুদ্রাস্ফীতি বর্তমান গতিতে বাড়তে থাকলে অনুমোদিত বর্ধিত বেতনক্রম দু'দিনের মধ্যেই অর্থহীনতায় পর্যবসিত হবে। তা ছাড়া আমাদের ভুললে চলবে না যে, আমাদের বহুবিধ দুর্ভোগ-দুর্বিপাক-সত্ত্বেও, আমাদের নিজেদের সমস্যাই সমাজের একমাত্র, বা প্রধানতম, সমস্যা নয়, নিছক শিক্ষার ক্ষেত্রেও নয়। শিক্ষার প্রবাহকে টুকরো-টুকরো ক'রে ভাগ করা যেমন সম্ভব নয়, শিক্ষক সম্প্রদায়কেও তেমনি একটি অখণ্ড সত্তা হিসেবে বিচার করাই শ্রেয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়াদির শিক্ষকদের কথা মনে রাখা আমাদের অবশ্যকর্তব্য। আর্থিক সংকটের তাড়নায় তাঁরা আমাদের চেয়েও বেশি জর্জরিত, তাঁদের দাবিদাওয়া বিষয়ে রাষ্ট্রের উদাসীনতা আরো বেশি প্রকট। আমাদের আন্দোলনকে তাই তাঁদের আন্দোলনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী মিশিয়ে দিতে হবে, ব্যক্তিগতভাবে এটাই আমার দৃঢ় প্রত্যয়। তাঁদের তুলনায় আমাদের আন্দোলন বলশালী, আমাদের বলই তাঁদের বল, আমাদের ভরসা তাঁদের ভরসা, একান্ত নিজেদের নিয়ে ব্যাপৃত থাকলে আমাদের চলবে না।

কিন্তু শুধু কি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমস্যা? এক-দিকে আর্থিক উন্নতির গতি অবরুদ্ধ, অন্য দিকে মুদ্রাস্ফীতি, এই উভচাপে পিষ্ট হচ্ছেন দেশের অধিকাংশ জনসাধারণ। এই অবস্থায়, আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি, নৈরাজ্য ক্রমবর্ধমান, শিক্ষার পটভূমি আস্তে-আস্তে সংকুচিত হয়ে আসছে। গ্রামে যে-দিনমজুর অন্নহীন, ছেলেমেয়েদের পাঠশালায় পড়তে পাঠানোর প্রস্তাব তাঁর কাছে অশ্লীল রসিকতার মতো ঠেকবে; পাঠশালা যে-সময়ে বসবে, তাঁর ছেলেমেয়েরা তখন হয়তো খুদ কুড়োতে ব্যস্ত, নয়তো একটা-দুটো পয়সার জন্য মাঠে জন খাটছে। শহরাঞ্চলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিশের অভাব ও হু-হু মূল্যবৃদ্ধি সমান অস্থিরতার উদ্রেক করেছে: কাগজ-কালি-বই-খাতার দামের কথা ছেড়েই দিলাম, যেখানে কোনোক্রমে বেঁচে-থাকাটাই সবচেয়ে বড়ো সমস্যা, শিক্ষা সেখানে শিকেয় তোলা হ'তে বাধ্য।

শিক্ষার উপর ইদানীং আর্থিক সংকটের এই ঘনান্ধকার ছায়া পড়েছে, কিন্তু, সন্দেহ হয়, সমস্যার অন্য আরেক দিকও আছে। বলতে ক্ষোভ হয়, গ্লানিবোধ হয়, আমাদের দেশনায়করা শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে আলাদা ক'রে চিন্তা করা সম্ভবত কোনোদিন প্রয়োজনীয় বোধ করেননি। যে-অর্ধঔপনিবেশিক, অর্ধসামন্ততন্ত্র-আশ্রয়ী ব্যবস্থা গত শতক থেকে প্রবহমান ছিল, তারই একটু সম্প্রসারণ ক'রে আজ পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়া হয়েছে, হচ্ছে। অন্যান্য বহু জায়গায়, উদাহরণত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির উল্লেখ করতে পারি, শিক্ষাপ্রণালীকে আর্থিক-তথা-সামাজিক প্রগতির পরিকল্পনার ছকে নিবিড় ক'রে গাঁথা হয়েছে, শিক্ষার নির্ভরেই যে জাতীয় উন্নতির মূল সম্ভাবনা, তা স্বীকার করা হয়েছে, সে-স্বীকৃতির ব্যবহারিক প্রয়োগ ঘটেছে, বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার পাঠক্রম জীবনের বিবিধ সমস্যা ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে তৈরি করা হয়েছে। অন্য পক্ষে, আমাদের দেশে, স্বাধীনতা-উত্তর এই পঁচিশোর্ধ বছর স্রেফ গতানুগতিকতায় অতিবাহিত হয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এখানে রাজ্যে-রাজ্যে অসাম্য, কলেজে-কলেজে অসাম্য, বিশ্ব-বিদ্যালয়ে-বিশ্ববিদ্যালয়ে অসাম্য : কেউ-কেউ পরম রাষ্ট্রপ্রসাদপুষ্ট, মুষ্টিমেয়র পরিচর্যায় নিয়োজিত, অপর্যাপ্ত আর্থিক সাচ্ছল্যে উপচোনো অবস্থায়। তারই পাশাপাশি, শত-শত বিদ্যায়তন, ছাত্রছাত্রীর ভিড়ে গাদাগাদি অবস্থা, অর্থ-কৃচ্ছ্রে জরাজীর্ণ, বছরের পর বছর ধ'রে অবহেলিত। মাঝে-মাঝে আশঙ্কা হয়, এ যেন প্লেটো-বর্ণিত সেই রিপাবলিকে আমরা উত্তীর্ণ হয়েছি, যার ভিত্তি ঘোর অসাম্যের উপর, যেখানে শিক্ষা-আচারকলা সব-কিছু গণ্ডিকৃত-পরস্পর-বিচ্ছিন্ন। আপনারা তো জানেন, এমনকি কলেজে-কলেজে সুয়োরানী-দুয়োরানী ভেদাভেদ, এক কলেজে অধ্যাপকরা এক বিশেষ হারে ভাতা পাচ্ছেন, পাশের কলেজে সম্পূর্ণ আরেক হারে। পাঠক্রম এবং পরীক্ষাব্যবস্থায়ও সমান চিন্তা-হীনতা। আমরা যা পড়াচ্ছি, আমাদের ছাত্রছাত্রীরা যা পড়ছে, বহু ক্ষেত্রে আমাদের চেতনার তথা জীবনধারার সঙ্গে তার সামান্যতম যোগও নেই : অন্য নানা বহির্সমস্যা যদি না-ও থাকতো, তা হ'লেও এ-অবস্থায় অবসাদ না-এসে পারে না। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বুঝতে পারছি, পুরোনো পরীক্ষা-রীতি ভেঙে পড়েছে, লাঠিপেটা ক'রে সেটা চালু রাখার চেষ্টা করলে প্রতীপ ফল হবে, অথচ, বছরের পর বছর ধ'রে, পর্যালোচনাই চলছে, সংস্কার এখনো পরাহত।

সংকট তাই ভিতরে-বাইরে দু'দিকেই। যেখানে উৎপাদন ব্যাহত, বণ্টন-

-ব্যবস্থা ছিন্নভিন্ন, বিনিয়োগ তুচ্ছ, বেকারী ক্রমবর্ধমান, শিক্ষাপ্রসঙ্গ সেখানে উপহসনীয়। অন্য দিকে যে-শিক্ষাব্যবস্থায় সৌষাম্য অনুপস্থিত, শিক্ষা যেখানে জীবনের ও সমাজের সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন, পরীক্ষাপ্রণালী যেখানে নিষ্প্রাণ নিয়ম-নিষ্ঠা, সেখানেও সর্বনাশের সূচনা। এ-অবস্থায় আমাদের কর্তব্য স্পষ্ট। যাঁরা রাষ্ট্রের হাল ধ'রে আছেন, যাঁরা নীতিনির্ধারক, তাঁদের কাছে বিনীত অনুরোধ, দেশকে যদি বাঁচাতে চান, সমাজ-সংস্কৃতি-জ্ঞানচর্চা সম্বন্ধে যদি আপনাদের সামান্য-তম শ্রদ্ধাও থাকে, তা হ'লে, দোহাই, শিক্ষার সমস্যাকে পাশে ঠেলে রাখবেন না, শিক্ষাক্ষেত্রে যে-আমূল বিপ্লবের কথা বহুবার উত্থিত, আলোচিত হয়েছে, তাকে ক্ষিপ্রগতি করুন, সেইসঙ্গে মুদ্রাস্ফীতি দৃঢ়হস্তে শাসন করুন, কতগুলি ন্যূনতম সামাজিক শৃঙ্খলা পুনঃপ্রবর্তন করুন, খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য অবশ্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি ন্যায্যমূল্যে সুষ্ঠু এবং সম বণ্টনের ব্যবস্থা করুন, আর্থিক প্রগতি যাতে ফের অর্গলমুক্ত হ'তে পারে তার জন্য যথাযথ প্রথা প্রয়োগ করুন, যে-সমাজশত্রুরা মূল্যবৃদ্ধি ও সীমিত তৈজসের সুযোগ নিয়ে দরিদ্রতর শ্রেণীকে বিনা দ্বিধায় শোষণ করছে তাদের প্রতি অকরুণ হোন, গ্রামীণ ভূমি- ও কৃষি -ব্যবস্থায় পরিবর্তন ত্বরান্বিত করুন। যদি এ-সমস্ত সম্পর্কে তাঁরা যথেষ্ট আগ্রহবান না হন, তা হ'লে ভারতবর্ষ, আশঙ্কা হয়, অচিরে শৃগাল-কুকুরের ভাগাড়ে পরিণত হবে, সামাজিক ক্লেদ বাড়তে-বাড়তে বিস্ফোরণের স্তরে পৌঁছুবে, শিক্ষা নিয়ে আর-কেউ মাথা ঘামাবে না তখন।

ইতিমধ্যে আমাদের অপেক্ষাকৃত ঘরোয়া কতিপয় সমস্যা থেকেই যাবে। আমরা জানি, সামাজিক অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে কিছু-কিছু তঞ্চক তাঁদের আখের গোছাবার তালে ব্যস্ত থাকেন। এমন কয়েকজন বিদ্যায়তন পর্যন্ত খুলে বসেন, সে-বিদ্যায়তন সরকারি স্বীকৃতি পায়, তার শিক্ষকদের জন্য সরকার ভরতুকির ব্যবস্থাও করেন। কিন্তু যেহেতু এরকম অনেক শিক্ষায়তনে প্রায় মধ্যযুগীয় মালিকানা সম্পর্ক আজও বহাল আছে, শিক্ষকরা নির্ধারিতহারে বেতন পান না, অথবা পাহাড়-প্রমাণ বকেয়া জমে থাকে। অনেক সময় এমনও হয়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে যে-সাহায্য বিদ্যালয়গুলিকে পৌঁছে দেওয়ার কথা, তাতে ভাঁটা পড়ে, এবং তার কারণ এই রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ব্যাপক অর্থাভাব। মূল্যবৃদ্ধি, বিদ্যুৎসংকট ইত্যাদির প্রকোপে আরো বিশেষ ক'রে, অধিকাংশ বে-সরকারী কলেজেরই ইদানীং নাভিশ্বাস অবস্থা। সরকারের কাছে আবেদন করবো, যে ক'রেই হোক, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়াদির আর্থিক প্রসঙ্গ সম্পর্কে

আরো-একটু অবহিত হোন। মুদ্রাস্ফীতি এবং মূল্যবৃদ্ধির প্রাথমিক দায়িত্ব যেহেতু রাষ্ট্রনায়কদের, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষায়তনের আর্থিক সমস্যা নিরসনের দায়িত্বও তাঁদের নিতে হবে।

আমি এমন কিছুতেই বলছি না যে প্রাথমিক-মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার খাতে ব্যয়সংকোচ ক'রে সেই উদ্‌বৃত্ত অর্থ দিয়ে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সেবা করা হোক। সেটা পাপ কাজ হবে। বিবেকের দিক থেকে দেখুন, সামাজিক ন্যায়ের দিক থেকে বিচার করুন, আর্থিক প্রগতির প্রকল্পন হিশেবে ধরুন, সবচেয়ে আগে প্রাথমিক শিক্ষার দাবি। দেশের অধিকাংশ দরিদ্র মানুষ, যাঁরা ছড়িয়ে আছেন সহস্র-লক্ষ পল্লীতে-প্রান্তরে, শহরের বস্তিতে, শহরতলীর কলোনীতে, কারখানার মজুরঘাঁটিতে, তাঁদের জন্য শিক্ষার আয়োজন প্রথমতম কর্তব্য, শ্রেয়তম কর্তব্য, পুণ্যতম কর্তব্য। অগ্রাধিকার সেখানে। কিন্তু অগ্রাধিকারের বাইরেও কিছু দায়িত্ব থেকে যায়। তা সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে সরকারের ধ্যানধারণাসংক্রান্ত। কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়াদির আর্থিক দায় সরকারের পক্ষে তাই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, উচিতও নয়, যেমন উচিত নয় কলেজ ও বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে বৈষম্যবিধৃত নীতি। একটু সাহস সঞ্চয় ক'রে বলছি, জাতির অন্তিম স্বার্থের দিক থেকে বিবেচনা করলে, শিক্ষার গুরুত্ব প্রতিরক্ষার চেয়ে এক ফোঁটা কম নয়, বরং বেশি। দেশকে-সমাজকে রক্ষা করতে হ'লে সামরিক প্রস্তুতি যেমন প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন সুচারু শিক্ষাব্যবস্থার। যে-সমাজে ছাত্রছাত্রীরা অবহেলিত, শিক্ষকরা বুভুক্ষু, সে-সমাজের অবক্ষয় কেউ আটকাতে পারে না, সাঁজোয়াবাহিনীও তাকে বাঁচাতে অপারগ। কোথায় ব্যয়সংকোচ করলে, কী উপায়ে উপার্জন বৃদ্ধি ঘটালে, রাষ্ট্রের পক্ষে শিক্ষার খাতে অধিকতর বরাদ্দ সম্ভব, তার উত্তর জোগানোর প্রাথমিক দায়িত্ব ঠিক শিক্ষক-শ্রেণীর উপর বর্তায় না। কিন্তু এ-ব্যাপারেও, আমি জানি, শিক্ষক সম্প্রদায় সব ঋতুতেই সরকারের সঙ্গে আলোচনায় প্রস্তুত। আশা করবো, তাঁদের এই আহ্বান প্রত্যাখ্যাত হবে না।

সেইসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কর্তৃপক্ষের কাছেও সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাবো, সবাই তো আমরা বুঝতে পারছি, ক্রান্তির লগ্ন উপনীত, এ-অবস্থায় ছাত্র- এবং শিক্ষক-সম্প্রদায়কে আর কতদিন উদ্দেশ্যহীন অনিশ্চয়তায় নির্বাসিত রাখবেন, পরীক্ষাপ্রণালী এবং পাঠক্রম পরিবর্তনের ব্যাপারে দয়া ক'রে আর বিলম্ব ঘটাবেন না, সকলের সঙ্গে সমবেত হয়ে এবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। তা ছাড়া, এ-সমস্ত

সিদ্ধান্তে পৌঁছুবার আগেও, বর্তমান সংস্থানেও, পরীক্ষার ক্ষেত্রে কি আরো-একটু শৃঙ্খলা আনা সম্ভব নয়, পরীক্ষাপ্রাঙ্গণে এবং অন্যত্র বহিরাগত সমাজ-বিরোধীদের সন্ত্রাসের হাত থেকে শিক্ষকদের রক্ষা করবার উদ্যোগে কর্তৃপক্ষ কি সম্পূর্ণ অসমর্থ, আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা একটু সুঠাম ক'রে পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা সামান্য ত্বরান্বিত করা কি আদৌ অসম্ভব? বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নানা অসুবিধার কথা অবশ্যই অস্বীকার করছি না, কিন্তু বছরের-পর-বছর ধ'রে পরীক্ষার এই অব্যবস্থা, ফলাফলের জন্য এই দীর্ঘ অপেক্ষা, যা ছাত্রদের আরো গভীর সংকটের গহ্বরে ঠেলে দিচ্ছে, তা, হয়তো বা একটু চেষ্টা করলে, কিছুটা সংশোধিত-সংক্ষেপিত করা যায়। এ আমাদের সকলের সমস্যা, কারণ এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে সামাজিক স্থৈর্যের সমস্যা।

সামাজিক অস্থিরতা উৎকীর্ণ পর্যায়ে পৌঁছুলে কী প্রলয়ংকর রূপ নিতে পারে, তার ঈষৎ আভাস আমরা পেতে শুরু করেছি। এখানে-ওখানে, সংবাদপত্রে, দেশনেতাদের বিবৃতিতে, প্রায়ই আজকাল আক্ষেপ শোনা যায়, শিক্ষার মান নিম্নগামী, অধ্যাপকরা অধ্যাপনাবিমুখ, ছাত্রেরা নৈরাজ্য-আশ্রয়ী। শিক্ষার মান যদি ধ্বংসে পড়তে থাকে, তার চেয়ে শোকাবহ কিছু নেই, কারণ তা হ'লে দেশের সংস্কৃতির মানও গড়িয়ে নিচে নামবে, সেই সঙ্গে চিন্তার মান, বুদ্ধির মান। ছাত্রসম্প্রদায় পাঠপরাঙ্মুখ, তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক উচ্ছৃঙ্খল, শিক্ষকদের সম্বন্ধে অশ্রদ্ধাশীল, তার চেয়ে বড়ো সর্বনাশও কিছু হ'তে পারে না। যে-আক্ষেপগুলি শোনা যায়, তাদের অধিকাংশই খানিকটা-খানিকটা সত্য। অথচ, যদি ঘুরিয়ে প্রশ্ন করা যায়, ছাত্রেরা কেন পঠনপাঠনে মনোযোগ দেবে, কলেজ ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরোলে তাদের জন্য কী উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা ক'রে আছে যে তারা পূর্ণোৎসাহে পাঠ্যবিষয়ে মনোনিবেশ করবে, আমাদের সমাজনায়কদের আচার-আচরণ থেকে কী নীতি-শিষ্টাচার গ্রহণ করবে তারা, তা হ'লে কী উত্তর দেবো আমরা? আমরা কি ছাত্রসমাজকে ডেকে বলতে পারি: তোমাদের জন্য সব প্রস্তুত? আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় যেমন কোনো চিন্তার ছাপ নেই, সমান এলোমেলো হতশ্রী অবস্থা তেমনি অন্যত্রও। ছাত্রছাত্রীরা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে কালক্ষেপণ করছে, নিষ্প্রাণ যান্ত্রিকতার সঙ্গে পাঠক্রম সম্পূর্ণ করছে, অনেকের কাছেই যা লক্ষ্যহীন চর্বিতচর্বণ, কিন্তু তার পর? তার পরেও তো সমান লক্ষ্য-হীনতা: পাঠ সমাপ্তি মানেই তো যুবসম্প্রদায়ের এক ছোটো কারাগার থেকে ধাক্কা খেয়ে বেরিয়ে দেশ-জোড়া এক মস্ত কারাগারে উত্তরণ। দেশের আর্থিক

প্রগতি থমকে দাঁড়ানো, কর্মপ্রাপ্তির সুযোগ-সুবিধা সংকীর্ণতম, অথচ তরুণ-তরুণীদের অভীপ্সা-আকাঙ্ক্ষা কালের হেতুতে ক্রমশ উর্ধ্বমুখী : আশাভঙ্গের রুক্ষ-উষর ভূমি ছাড়া সুতরাং তাদের জন্য উপস্থিত আমাদের অন্য কোনো যৌতুক নেই। এরকম মুহূর্তে ছাত্রছাত্রীদের মামুলি বচন শুনিয়ে, ভদ্র হবার - শিষ্ট হবার - সাধু থাকবার পরামর্শ দিয়ে বিশেষ লাভ নেই। বাইরের পরিবেশ যখন এমন প্রতিকূল, অধ্যাপকসমাজের কাছ থেকেও তখন আশ্রমসুলভ নিষ্ঠা-অধ্যবসায়-তিতিক্ষা আশা করা, আমি বলবো, একটু বেশি আশা করা। সীমিত আয়ে, সার্বিক অভাবের চাপে, মুদ্রাস্ফীতির পীড়নে শিক্ষককুলের পক্ষে অধ্যাপনা-অধ্যয়ন-আদর্শে কতটা অবিচল থাকা সম্ভব, তা দেশের সাধারণ মানুষ বিচার করবেন। শিক্ষকদের র‍্যাশনের লাইনে দাঁড়াতে হয়, কেরোসিনের ধান্দায় ঘুরতে হয়, বাজারে গিয়ে মূল্যমানের চেহারা দেখে উর্ধ্বনেত্র হ'তে হয়, ট্রাম-বাসের ভিড়ে উজান ঠেলে এগোতে হয়, কতগুলি মধ্যবিত্ত সামাজিকতার দাবি মেটাতে হয়, কী ক'রে মাসিক আয় সামান্য-একটু বাড়ানো যায় সে-চিন্তায় বিনিদ্র হ'তে হয়। এর পরেও যদি কেউ শিক্ষকদের কাছ থেকে বশিষ্ঠের আশ্রমের তন্ময়তা প্রত্যাশা করেন, তা হ'লে শুধু বলবো আশা ন্যায়তই ছলনাময়ী।

তবু স্বীকার করছি কিছু-কিছু বৃত্তিগত দায়িত্ব শিক্ষকদের থেকেই যায়। সমাজ যদি শিক্ষককুল সম্বন্ধে চরম উদাসীনতা অবলম্বন করেও, শিক্ষকদের অর্ধভুক্ত-জীর্ণকন্থা অবস্থায় থাকতে হ'লেও, আমাদের বৃত্তির কতগুলি বিশেষ অঙ্গীকার আছে। এ-সমস্তই স্বেচ্ছা-অঙ্গীকার, বিবেকের তাড়না। সমাজ থেকে আদর্শ যদি অন্তর্হিত হয়ে থাকে তা হ'লে আদর্শকে ফিরিয়ে আনার তাগিদে আর কেউ এগিয়ে আসবেন ব'লে মনে হয় না, আসবে না দেশনায়করা —তাঁরা নিজেদের সমস্যা নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত—, আসবেন না সান্ত্রীসদাগররা, আসবেন না সাংবাদিকরা বা অন্য-কেউ। ক্ষুৎপিপাসায় বিব্রত, শরীরে-মনে ক্লেদ, তা হ'লেও আদর্শকে পুর্নপ্রোথিত করতে এগিয়ে যেতে হবে আপনাদেরই, যাঁরা বুদ্ধিজীবীকুলচূড়ামণি। ছাত্রদের প্রসঙ্গেই ফের আসি। এখন যারা ছাত্র-ছাত্রী, তাদের একটি বিরাট অংশ, যদিও কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের নাম-লেখানো আছে, পড়াশুনার সঙ্গে তাদের আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই, এক বিস্ফারিত দায়িত্বহীনতায় তারা গা ভাসিয়ে দিয়েছে, এরকম অভিযোগ। শিক্ষক-শ্রেণী যে-সমাজসংস্থা থেকে আসেন, ছাত্রছাত্রীরাও তো বেশির ভাগ সেখানে

থেকেই আসে। যেখানে অধ্যাপকসম্প্রদায় আর্থিক সংকটের চাপে ওষ্ঠাগত-প্রাণ, ছাত্রছাত্রীদের বেলাতেও তো একই অবস্থা: তাদেরও র‍্যাশনের জন্য লাইনে দাঁড়াতে হয়, বাজারের চেহারা দেখে ভিরমি খেতে হয়, কেরোসিন-কয়লা-বিদ্যুতের অভাবে জর্জর হ'তে হয়, ট্রাম-বাসের রুদ্ধশ্বাস ভিড়ে পর্যুদস্ত হ'তে হয়, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের অভাবে ছটফট করতে হয়। এবং, এ-সমস্ত থেকে একটু আল্‌গা হয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে যে-মুহূর্তে তারা ভাবতে শুরু করে, গাঢ়তর এক অন্ধকার তাদের চেতনা আচ্ছন্ন ক'রে নামে। হয়তো সেজন্যই, যেহেতু তারা প্রাত্যহিকতার অভিশাপ কিছুক্ষণের জন্যও ভুলে থাকতে চায়, ভবিষ্যতের তমিস্রার কথা খানিকক্ষণের জন্য হলেও মন থেকে সরিয়ে দিতে চায়, তারা চটুলতায় আশ্রয় খোঁজে, মহৎ কোনো গ্রন্থ ফেলে রেখে সস্তা, চুটকি সাহিত্য পড়ে, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস বা গণিতরহস্যের মধ্যে না-ঢুকে তারা হয়তো চলে যায় ঠুনকো, ভ্যাপসা, অলীক-রঙিন সিনেমার আঙিনায়। যাঁরা আদর্শে তন্নিষ্ঠ থেকেছেন, আদর্শের জন্য প্রাণপাত করেছেন, তাঁদের প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ থাকে না; বরং যাঁরা ফিকিরে দু'পয়সা উপায় করেছেন, আদর্শ-হীনতার খাতিরে ভর ক'রে, সাময়িকভাবে হলেও, খ্যাতির শিখরে পৌঁচেছেন, তাঁদের নিয়ে তরুণ-তরুণীদের ভাবনাজল্পনা। তারা হয়তো ভুলে থাকতে চায়, সামান্য কিছুক্ষণের জন্য হলেও ভুলে থাকতে চায়, যে তাদের কোনো আশা নেই, তারা ভাগ্যহত: সামান্য কিছু সময়ের জন্য হলেও মরীচিকামদির স্বপ্নের ফানুসে ভেসে বেড়াতে উদ্‌গ্রীব তারা, নেশাকে তারা আঁকড়ে ধরে।

এই প্রবণতা সর্বনেশে। এই ভঙ্গুরতাপ্রীতি, এই আদর্শহীনতার আদর্শ ছড়িয়ে পড়লে জাতি হিসেবে কোনোদিনই আর আমরা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারব না। অধ্যাপক-শিক্ষকসম্প্রদায়ের মস্ত দায়িত্ব এখানে। পরিবেশ যত প্রতিকূল হোক, এ-দায়িত্ব আমাদের পালন করতেই হবে। যারা ছাত্রছাত্রী, তারা আমাদের থেকে আলাদা নয়। তারা আমাদের আত্মজ, আমাদেরই সন্তানসন্ততি, একটু আগে যা বলা হয়েছে, সমাজের যে-স্তর থেকে আমরা এসেছি, তারাও সেখান থেকেই। আমাদের পক্ষে তাই ঘরের সমস্যা এবং বাইরের সমস্যা একাকার হয়ে এসেছে, এমন না হয়ে পারে না, যেহেতু উভয় ক্ষেত্রেই সমস্যার উৎস এক। শিক্ষক এবং ছাত্রসমাজের মধ্যে প্রথাগত প্রাচীর ভেঙে আমাদেরই দায়িত্ব তাদের কাছে টেনে আনার, তাদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করার, তাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যা যে আমাদের সমস্যারই পরিপূরক

সেটা বোঝা, বোঝানো। পলায়নে, হাল্কা হাওয়ায় ভেসে-বেড়ানোয় যে কোনো মুক্তি নেই, বরং তাতে সর্বনাশ আরো দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসবে, ছাত্রসমাজের যে-অংশ হালে ঈষৎ বিচলিত এটা তাদের জানানোর দায়িত্ব আমাদেরই সানন্দে, মাথা পেতে নিতে হবে। আমরা যদি সবাই পৃথগীকৃত বিভঙ্গে হতাশার কাছে আত্মসমর্পণ করি, তা হ'লে মৃত্যু অবধারিত ; অন্য পক্ষে, যদি আমরা সম্মিলিত হই, শিক্ষকদের সমস্যাকে ছাত্রদের সমস্যার সঙ্গে একীভূত করতে পারি, শিক্ষক-দের আন্দোলনকে ছাত্রদের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করতে পারি, তারপর এই দ্বৈত আন্দোলনকে দেশের অসংখ্য সাধারণ মানুষের চিন্তাভাবনার ধারার সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারি, তা হ'লে আমি অন্তত বিশ্বাস করি, সব সমস্যাই অন্যরকম চেহারা নিয়ে উপস্থিত হবে, যে-আদর্শ আমাদের ঐতিহ্য, সে-ঐতিহ্যে আমরা আমরা সবাই ফিরে যেতে পারব।

আমরা পছন্দ করি কিংবা না-করি, আমাদের ভালো লাগে কি না-লাগে খণ্ড-খণ্ড যূথবদ্ধতার দিন শেষ হয়ে এসেছে। দ্বৈপায়নিক আচরণে এখন থেকে ছেদ না-টেনে উপায় নেই: দৈনন্দিন দাবি-দাওয়ার ব্যাপারেই হোক, সুচারু শিক্ষাবিন্যাসের ক্ষেত্রেই হোক, অথবা সামাজিক আদর্শবিস্তারের লক্ষ্যেই হোক, আলাদা-আলাদা, নিছক আমাদের নিজেকে নিয়ে, আন্দোলন করার ঋতুর অবসান ঘটেছে। আমাদের সমস্যা দেশের সামগ্রিক সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন নয় ; দেশের সাধারণ মানুষের সমস্যা থেকে ভিন্ন নয়, ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা থেকেও অন্যতর নয়। একই মোহানায় আমাদের মিলতে হবে। যদি তা পারি, তা হ'লে, আমার ধ্রুব প্রত্যয়, অনেক জাতীয় সমস্যাই সমাধানের দিকে এগোবে, অবরুদ্ধ আর্থিক উদ্যোগে ফের জোয়ার আসবে, অধ্যাপনা-অধ্যয়নে আমরা ঐতিহ্যগত আনন্দ পুনরাবিষ্কার করব, দেশের যুবসমাজ স্থিরতর আদর্শে প্রত্যাবৃত হবে, আমাদের সঙ্গে তাদের আত্মার আত্মীয়তা নিবিড়তর হবে।

হরেকৃষ্ণবাবু

১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি মুহূর্ত। দিল্লিতে আছি, কৃষিপণ্য মূল্য কমিশনের হাল ধ'রে, ঠুঁটো জগন্নাথ: রিপোর্ট লিখি, মন্ত্রী মশাইরা আলতো ক'রে সে-রিপোর্ট পাশে সরিয়ে রাখেন, এমনকি খবরের কাগজেও সে-রিপোর্টের সারাংশ যাতে না-বেরোয়, তার জন্য সচেষ্ট থাকেন। মারাত্মক কথাবার্তা-ভরা রিপোর্ট: কৃষিপণ্যাদির দাম অমন হু-হু ক'রে বাড়ানো অকর্তব্য, তাতে গরিব চাষী, দিন-মজুর প্রভৃতি যাদের বাজার থেকে শস্য আহরণ করতে হয়, তাদের মারা পড়বার আশঙ্কা, মুষ্টিমেয় ভূম্যধিকারীর ফুলে-ফেঁপে ওঠার আশঙ্কা, মুদ্রাস্ফীতি ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা।

কা কস্য পরিবেদনা: যাঁরা মন্ত্রী হয়েছেন, তাঁরা নিজেদের তথা পরিজনদের আখের গুছোবার জন্যই মন্ত্রী হয়েছেন, স্ব-শ্রেণীর সম্পদ বৃদ্ধির জন্যই মন্ত্রী হয়েছেন, খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য জিনিশপত্রের দাম বাড়ানো ঠিক নয় এমন উট্‌কো কথা তাঁরা মানবেন কেন? মূল্যমান স্থির রাখবার পরামর্শ দিয়ে তাই আমিই যেন চোর ব'নে থাকি, মন্ত্রীদের এবং শাসক দলের আরো বাঘা-বাঘা রথী-মহারথীর বাক্যবাণ শুনতে হয়। তাই রিপোর্ট লিখি, এবং নিজেকে সান্ত্বনা দিই: মা ফলেষু যেহেতু কদাচন, এত মনমেজাজ খারাপ করবার কী আছে।

মাঝে-মাঝে দিল্লি থেকে বেরিয়ে পড়ি, এ-রাজ্য, ও-রাজ্য ঘুরে বেড়াই, কৃষিক্ষেত্রে কোথায় কী হচ্ছে, চোরেরা কোথায় কী প্রকরণে নিজেদের বর্গক্ষেত্র বিস্তার করছে যতদূর জানা যায় জানার চেষ্টা করি।

১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি সময়। কলকাতায় এসেছি, রাইটার্স বিল্ডিং-এ সরকারি বৈঠক। যুক্তফ্রন্ট সরকার এখানে, কিন্তু যিনি কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী, তিনি বাঘা-বাঘা জোতদারেরও বাড়া, পুরোনো কাসুন্দির চর্বিতচর্বণ, সব শুনে-টুনে বিরক্ত-ক্লান্ত হয়ে বেরিয়ে আসছি, হঠাৎ মনে পড়ায় সঙ্গের সহকর্মীকে বললাম: চলুন, আপনাকে এক অন্য পৃথিবীর মন্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।

হরেকৃষ্ণবাবু ঘরেই ছিলেন। ঢুকলাম, সহকর্মীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে

দিলাম, সহাস্য অভিনন্দনের সঙ্গে বসালেন। একটু-একটু ক'রে কথাবার্তা এগোলো, কৃষি-সমস্যা থেকে ভূমি-সমস্যা, ভূমি-সমস্যা থেকে ধনী চাষী, মধ্যবিত্ত চাষী, ভাগচাষী, গরিব চাষী, মজুর চাষীর সমস্যা, বিভিন্ন সমস্যার পারস্পরিক সম্পর্ক, দেশের নানা প্রান্তে সমস্যার রূপান্তর, এমন ধরনের নানা কথা। হরেকৃষ্ণ-বাবু বলছেন, আমরা শুনছি, মাঝে-মাঝে একটা-দুটো স্বল্পবাক্ প্রশ্ন করছি, পর-মুহূর্তে ফের চুপ হয়ে যাচ্ছি, কারণ হরেকৃষ্ণবাবু আমাদের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত মূল সমস্যার গহনে সঙ্গে-সঙ্গে প্রবেশ ক'রে গেছেন। আমার সহকর্মী অবাঙালি, হরেকৃষ্ণবাবু ইংরেজিতেই বলছেন, তাঁর ইংরেজি-বাচন কেতাদুরস্ত ঠিক নয়, কিন্তু বাচন তো উপলক্ষ মাত্র, যেখানে চিন্তায়-ভাবনায় বিন্দুমাত্র জড়তাও নেই, ভাষা সেখানে অনুগত দাসের মতো। তিনি হাজার হ'লেও মন্ত্রী, আমরা প্রায়-আমলা, অথচ আসলে যেন তা নয়, তিনি শিক্ষক, আমরা অধ্যয়নশীল ছাত্র, তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করছি। জীবনের যুদ্ধক্ষেত্রে যা শেখা যায়, সে-জ্ঞানের তুলনা নেই। পুঁথিপড়া জ্ঞান নয়, রক্তে-চেতনায়-ধমনীতে যে-জ্ঞানের প্রবাহ, তার উৎস হাটে-মাঠে-খেতে-ঘাটে-খালপাড়ে, তার উৎস অত্যাচারী জমিদারের বিরুদ্ধে সবাইকে নিয়ে কাতারে-কাতারে জোট বাঁধায়, রাষ্ট্রশক্তির শ্রেণীচরিত্রের বিরুদ্ধে সমাজের দরিদ্রতম সম্প্রদায়ের চেতনা সঞ্চারের প্রয়াসে। হরেকৃষ্ণবাবু ব'লে যাচ্ছেন, আমরা শুনছি, একটা-দুটো প্রাসঙ্গিক তর্ক উত্থাপন করছি, তিনি প্রত্যুত্তর দিচ্ছেন, আমার সহকর্মী মন্ত্রমুগ্ধ।

ঘণ্টা-দুয়েক বাদে বিদায় নিয়ে নিচে নেমে এলাম, আমার সহকর্মী, পঁচিশ বছরের উপর কৃষি মন্ত্রণালয়ে সময় অতিবাহন করেছেন, পুরোনো পাপী, বিশ্বাসের পেরেকে তাঁর বহুদিন মরচে ধরেছে, অথচ বেরিয়ে এসে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে তাঁর প্রথম মন্তব্য : হায়, আমাদের কেন্দ্রে যদি অন্তত একজনও এমনধারা মন্ত্রী থাকতো।

সহকর্মীর ঐ বিলাপ অবশ্যই বাস্তবধর্মী ছিল না। হরেকৃষ্ণবাবুর মতো মন্ত্রী সেই ১৯৬৭ সালে কেন্দ্রে ছিল না, এখনো নেই, কারণ সরকার শ্রেণীচেতনার প্রতিভাস। নানা রাজ্যে ভূরি-ভূরি লোক-দেখানো অনেক ভূমিসংস্কার আইন নথিভুক্ত করা হয়েছে, কাতারে-কাতারে কেন্দ্রের অনেক মন্ত্রী সমাজতন্ত্রের বচন শুনিয়েছেন, কিন্তু ছোটো কৃষিজীবী তথা ভূমিহীন মজুরচাষী যে-তিমিরে সে-তিমিরেই—বিশেষ ক'রে গত দু-তিন বছরে, মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা, কেন্দ্রীয় সরকার নানা প্রকরণের মারফত খাদ্য এবং অন্যান্য পণ্যের দাম বাড়ানোর

যে-প্রকাশ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন, তাতে রাষ্ট্রশক্তির শ্রেণীচরিত্র আরো রুক্ষতার সঙ্গে প্রকট হয়েছে, ভবিষ্যতে আরো হবে। সেই সঙ্গে আরো লোক-ঠকানো আইনও নতুন ক'রে নথিভুক্ত হবে। শোষণ বাড়বে, অত্যাচার বাড়বে।

কিন্তু ইতিহাস বলে, সেই সঙ্গে প্রতিরোধও বাড়বে। ইতিহাস বলে ব'লেই প্রতিরোধ বাড়বে তা অবশ্যই নয়, শোষণ বাড়বে ব'লেই সাধারণ লোকে রুখে দাঁড়াবে, জোট বাঁধবে, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে লাঠি-সড়কি ঘোরাতে শিখবে। হরেকৃষ্ণবাবু সঙ্গে থাকলে আরো একটু দ্রুততার সঙ্গে হয়তো শিখতো। কিন্তু, হরেকৃষ্ণবাবু, মন্ত্রী হরেকৃষ্ণবাবু, নিজেই সেদিন আমাদের বলছিলেন, ইতিহাসে ব্যক্তি নিমিত্তমাত্র, সাধারণ মানুষ নিজেদের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে গিয়েই প্রতিরোধ করতে শিখবে, জোট বাঁধবে, তৈরি হবে. ইতিহাসের গতিকে সফল করবে। অনুকম্পায়ী মন্ত্রী হ'লে পাশ থেকে একটু-আধটু দুর্যোধন-দুঃশাসনদের প্যাঁচে ফেলতে পারেন মাত্র, আসল ইতিহাস কিন্তু রচনা করবে গ্রামে-গঞ্জে-বন্দরে জনতার অক্ষৌহিণী বাহিনী।

হরেকৃষ্ণবাবু চ'লে গেলেন, সাধারণ লোক চোখের জল ফেলবে আপনজনের বিয়োগ-ব্যথায়, কিন্তু আন্দোলন শ্লথ হবে না তাতে। শ্লথ হ'লেই বরঞ্চ মনে হবে হরেকৃষ্ণবাবুর পাঠশালায় কারো শিক্ষা অসমাপ্ত থেকে গেছে। অমন মন্ত্রী, যিনি নাস্তিক আমলাদের মনেও পাপবোধ ঢোকাতে পেরেছিলেন, এই রাষ্ট্রব্যবস্থার কাঠামোয় চট্ ক'রে আর হবার নয়। কিন্তু হ'লেই তো খট্কা লাগতো। আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা-ধনতান্ত্রিক এই নীপবনে মন্ত্রীরা পরস্বাপহরণ করবে, তস্করতাই তাদের ধর্ম, হরেকৃষ্ণবাবুরা হঠাৎ ক্ষণিকের অতিথি হয়ে এসেছিলেন মাত্র। আমার সহকর্মীর হতচকিত হওয়ার তাই কারণ ছিল।

সেই সহকর্মীটি এখনো সরকারি চাকরি করছেন, তবে ইদানীং তাঁকে আর হতচকিত হ'তে দেখি না। সেরকম কোনো কারণ তো আপাতত আর ঘটবে না : স্থিতি ভব, স্থিত ভব।

দুটো শরৎকালীন চিন্তা

১

এটা শরৎকাল, উজ্জ্বলতার ঋতু, আনন্দের ঋতু। বাঙালি আমি, রবীন্দ্রনাথের গানের ভিতর দিয়ে পৃথিবীকে চেনার প্রবণতা আমার, রবীন্দ্রনাথের গানের ভিতর দিয়ে আমার ভাবনা-অনুভাবনা নিজেদের প্রকাশ করতে উন্মুখ। শরৎকাল, শাদা-শাদা গাল-ফোলা মেঘ, ভরা নদী, কাশফুল, রবীন্দ্রনাথের গান : আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা গেঁথেছি শেফালিমালা / নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে সাজিয়ে এনেছি ডালা…

গলায় ঠেকে যায় গান, উচ্চারণ করতে পারি না, মুখ নিচু ক'রে বসে থাকতে হয়। ছন্নছাড়া দেশ, গুণ্ডাদের-হাতে-তুলে-দেওয়া সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, মন্ত্রীরা-চোর-না-চোররা-মন্ত্রী শাস্ত্রমীমাংসা এই তর্কের প্রান্তে ধুকপুক করছে, কাতারে-কাতারে লোক গ্রামে-গঞ্জে নিরন্ন-বুভুক্ষু, অথচ প্রতিবাদের পরিভাষা আপাতত বিপর্যস্ত। কোথায় নবীন ধানের মঞ্জরী, উপচে-পড়া প্রাচুর্যের উপচার সাজিয়ে কারা আর আসবে এই দুর্ভিক্ষের প্রহরে, রবীন্দ্রনাথের গান এখন নিরেট ব্যঙ্গ। শরৎকাল, নদী-খালের দু-পাড় আচ্ছন্ন ক'রে কাশফুল নিশ্চয়ই ফুটেছে, শেফালির সংস্কৃত সৌরভ আমাদের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে নাসারন্ধ্র আক্রমণ করবে, কিন্তু, তা হ'লেও, এটা গানের সময় নয়, রবীন্দ্রনাথের গান-কবিতা এই মুহূর্তে বীভৎস রসিকতা। দু-কান ঢেকে থাকতে হয় তাই।

যদি তা না-থাকি, তা হ'লে আসলে আমি দু-কান কাটা। দিল্লিতে সিকিম নিয়ে ঢলাঢলি হয়, ভূগর্ভে পরমাণু ফাটানো নিয়ে গর্বিত চর্বিতচর্বণে প্রহর কাটে, হয়তো আগামী বছর আকাশে এক ভারতীয় হাউই ঘুরে-ঘুরে রাজ্যেশ্বরীর মহিমা কীর্তন করবে, জাতির প্রতিরক্ষা বজ্রদৃঢ়তর হবে, নাগা-মিজোদের সিজিল করার জন্য কড়া ক'রে গেরো বাঁধা হবে। শুধু যা একটু ফাঁক থেকে যাবে তা ধর্তব্যের মধ্যেই নয় : দেশের অধিকাংশ লোক না-খেতে পেয়ে কাতরাবে, গ্রামে-গঞ্জে তাদের অনেকের শব পচবে, হাওয়া দূষিত করবে, তাদের মধ্যে

কেউ-কেউ শরীরটাকে টেনে-হিঁচড়ে রেল স্টেশনে চাই কি এমনকি কাছের শহরে হাজির করবে যদি দু-মুঠো খুদকণা মেলে এই আশায়। আশা বরাবরই ছলনা-ময়ী : জ্ঞান বাড়বে, কিন্তু তার আগেই বোধ হয় তাদের তুচ্ছাতিতুচ্ছ দেহ থেকে প্রাণ বেরিয়ে যাবে। রবীন্দ্রনাথের গান বেচারীদের কোনো কাজে লাগবে না, নবীন ধানের মঞ্জরী কিংবদন্তী হয়ে থাকবে।

অথচ এমন হবার কথা নয়, কোনো অঙ্কের হিশেবেই নয়। দেশে যা শস্যোৎপাদন, তা সুষ্ঠু বিতরণ করলে পর্যাপ্ত দু-মুঠো সকলেরই ভাগে জোটা সম্ভব। বিদেশীদের কাছে হাত পাতারও কোনো দরকার নেই, নিজেদের যা ফলন সমানভাবে তা সবাইকে পরিমাপ ক'রে দিলেই সমস্যার ইতি। কিন্তু সেরকম তো হবার নয়। সমাজতন্ত্রের ভণিতার দেশ এটা। যারা জলে ভিজে রোদে পুড়ে কাদায় হেজে গিয়ে ফসল ফলাবে, দেশের তিরিশ কোটি ভূমিহীন কৃষক তথা স্বল্পবিত্ত চাষী, এই সমাজকাঠামোয় তাদের জীবিকার-বাঁচবার অধিকার গ্রাহ্য নয়। তাদের আবাদী জমি নেই, জমিতে তাদের অধিকার নেই, অন্যের জমিতে তাদের জন খাটতে হয়, সব ঋতুতে কাজ মেলে না, যদিও বা মেলে, জন খেটে যা উপার্জন তাতে খিদের খাবার জোটানো সম্ভব নয়, কারণ মহানুভব সরকার শস্য তথা অন্যান্য জিনিশপত্রের হু হু দাম বাড়ানোর ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন। নিশ্চিন্ত, কোনো গরিবকেই আর খেয়ে বেঁচে থাকতে হবে না, সেরকম উপার্জন তাদের নেই। এ এক সুচারু প্রণালীতে উপনীত হওয়া গেছে : খাদ্যশস্যের দাম যত বাড়বে, সাধারণ শ্রমজীবীর আহারের পরিমাণ তত কমবে, আহার যত কমবে কাজ করার সামর্থ্যও তার তত হ্রাস পাবে, তার উপার্জনও অতএব ক্রমশ কমবে, সুতরাং তার আহারের পরিমাণ আরো কমবে, এমনি ক'রে আমরা এক চমৎকার সময়ে পৌঁছে যাবো যখন অভাবগ্রস্ত একজনও কেউ থাকবে না, কারণ তারা তার আগেই খিদের তাড়নায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তখন ফের শরৎ ঋতু সমাগত হবে, উজ্জ্বল ঝকঝকে রোদ্দুর, ভরা নদী টলমল সুখ, গান : মোর বীণা ওঠে কোন্ সুরে বাজি/কোন্ নব চঞ্চল ছন্দে ; আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা গেঁথেছি শেফালিমালা/নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে···।

সেই দিনের জন্য আমাদের প্রস্তুত হ'তে হবে। আপাতত যে-হতভাগ্যরা না-খেতে পেয়ে রেলসড়কের ধারে - শহরের-চৌমোহানায় - গ্রামের অশ্বত্থতলায় মুখ থুবড়ে মারা যাচ্ছে, কী করা যাবে, তারা তো আগে থেকেই সমাজতন্ত্রের

জন্য উৎসর্গীকৃতপ্রাণ। মুষ্টিমেয় আমাদের ক'জনের মতো তারা বাঁচার প্রকরণটা শেখেনি। তারা বরাবর বিশ্বাসে ভর দিয়ে চলেছে, বিশ্বাসঘাতকতা শেখেনি, চুরির শিকার হয়েছে, চুরি করতে শেখেনি, অমৃতভাষণ শুনেছে, নিজেরা মিথ্যাবাদী হতে পারেনি, মহারানীর জয়গান করেছে, মহারানীকে ঘৃণা করতে শেখেনি, ভাঁওতায় ভুলেছে, ভাঁওতার গহনে ঢুকে তার আসল সত্যটা প্রকাশ করতে শেখেনি। শেষ পর্যন্ত তারা তাদের সৌজন্য বজায় রেখে গেছে, তাদের ভদ্রতায় কোনো ত্রুটি থাকেনি। ভদ্র থেকে গেছে ব'লেই ঐ ছোটোলোকগুলি আজ মারা পড়ছে, আমরা ভদ্রলোকেরা ওদের পথে পা দিইনি ব'লে ওদেরই মুখের খাবার কেড়ে নিয়ে কেমন বেঁচে-বর্তে আছি, ভবিষ্যতে আরো থাকবো।

সুতরাং গলায় গান ঠেকে যাওয়া উচিত নয়। এটা শরৎকাল, উজ্জ্বলতম ঋতু, অতীতে রাজারা এ-সময় দিগ্বিজয়ে বেরোতেন. এসো, আমরা রবীন্দ্রসংগীত শুনি : আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা···

২

বাঙালিদের পুজোপার্বণ, বাঙালিদের শারদোৎসব। অথচ, আতঙ্কিত হয়ে আছি, পাড়ায়-পাড়ায় এবার বীভৎস লাউডস্পীকার সজাগ হয়ে উঠবে। উৎসবের ক'টা দিনের সঙ্গে আগু-পিছু আরো কিছু যোগ ক'রে, অন্তত পক্ষকাল ধ'রে, চটুল-ঠুনকো হিন্দি গানের বিভীষিকা চলবে। আপাতত এই আমাদের নিয়তি।

বললুম বিভীষিকা, কিন্তু সেটা তো আপনার-আমার মতো সামান্য কয়েক-জনের কাছে। সার্বজনীন উৎসব-অনুষ্ঠানাদির যাঁরা উদ্যোক্তা, তাঁরা ভাবতেই পারেন না আমাদের আপত্তির মূলসূত্রটি কোথায়, হিন্দি ফিল্মিগানই তো এখন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রধান আধার। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা, পানাজি থেকে ইম্ফল সর্বত্র ভারতবর্ষের মানুষ যে-কানুর বাঁশিতে এক সঙ্গে ত্বরিত-হরিণগতিতে সাড়া দেয়, সে-কানু বোম্বাই থেকে উত্থিত এই বোধবুদ্ধিহীন গান, গৃহকাজে-বাঁধা রাধারা এমন ক'রে আর কোন্ আহ্বানে সম্মিলিত আবেগে সাড়া দেন? আমি-আপনি তা হ'লেও যদি প্রতিবাদ জানাতেই থাকি, ক'দিন বাদে হয়তো আমাদের নামেই থানায় ডায়েরি লেখা হবে, ভারতরক্ষা আইনের কোনো বিশেষ ধারা বলে আমাদের স্তব্ধ ক'রে আনা চলে কিনা সে-বিষয়ে গবেষণা চলবে : যারা হিন্দি ফিল্মিগান পছন্দ করে না, অথবা পছন্দ না-করার ভাণ করে,

তারা ভারতবর্ষীয়দের একসূত্রে গাঁথার প্রচেষ্টার বিরোধী, সুতরাং তারা দেশ-দ্রোহী। এমনিতেই এ-দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের শেষ নেই, সীমান্তে বহিঃশত্রুরা সংঘবদ্ধ, কে বা কারা দেখুন তো মহান নেতা-নেত্রীদের বেকায়দায় ফেলবার জন্য জিনিশপত্রের দাম বাড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে। তার উপর ঘরের শত্রু বিভীষণ-গুলি যদি এমনকি হিন্দি ফিল্মের বিরুদ্ধেও কোমর বেঁধে লাগে, তা হ'লে যাঁরা দেশোদ্ধারে বদ্ধপরিকর, তাঁরা দাঁড়ান কোথায়? দিনকাল যে-ভাবে এগোচ্ছে, ধ'রেই নিতে পারেন একুশে আইন চালু হবার বেশি বাকি নেই, হিন্দি গানে আপত্তি জানালেই একুশ ঘা বেত্রাঘাত - বাইশ মাস ফাটক।

যা হচ্ছে তা ভেবেচিন্তেই হচ্ছে। জনসাধারণের মাথায় হাত বুলিয়ে গত আড়াই দশক ধ'রে রাজত্ব চালিয়ে গেছেন যাঁরা, বাণপ্রস্থের আকাঙ্ক্ষা তাঁদের আদৌ নেই। অতএব দেশবাসীকে অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখতেই হবে। সেজন্যই হিন্দি ফিল্মসংগীতের এত কদর। অস্বীকার ক'রে লাভ নেই, হিন্দি গান এক অভূতপূর্ব গ. সা. গু.; হাল্কা, ভঙ্গুর, ঠুনকো, সস্তা, কৃত্রিম, খেলো, যে-বিশেষণই ব্যবহার করুন-না কেন, তাতে এমন-এক মাদকতা আছে, যা নানা প্রদেশের নানা ভাষাভাষীর মানুষদের এক সঙ্গে সম্মোহিত করে, এক নিকৃষ্ট সানুভূমিতে টেনে নামায়। প্রথমবার শুনলে হয়তো ব্যাহত হ'তে হয়, কিন্তু দিনের-পর-দিন ঘণ্টার পর-ঘণ্টা ধরে আপনার কর্ণপটাহে বিরতিহীন আক্রমণ চলবে, একটু-একটু ক'রে আপনার প্রতিরক্ষা দুর্বল হ'তে থাকবে, চমকে-গমকে ক্রমবর্ধমান রুচিহীনতায় মুহ্যমান হ'তে-হ'তে আপনি হঠাৎ এক সময়ে সম্পূর্ণ বশ্যতায় শিথিল হয়ে আসবেন। এই রুচিহীনতার রাজনৈতিক প্রয়োজন আছে। রুচিবিকার যতই আপনাকে গ্রাস করবে, হিত-অহিতের প্রভেদ ততই আপনি ভুলতে থাকবেন, শ্রেয়-অশ্রেয় একাকার হয়ে আসবে, যা আজ অশ্রাব্য, কাল যেমন তা আপনার কাছে শ্রাব্যতমরূপে প্রতিভাত হবে, তেমনি চিন্তার ক্ষেত্রেও এক জড়তা আস্তে-আস্তে আপনার চেতনা ছেয়ে আসবে। মানবরুচি একটা অখণ্ড সত্তার ব্যাপার, তাকে আলাদা-আলাদা ক'রে নিরূপণ করা সম্ভব নয়; এমন হ'তেই পারে না আপনার গানের রুচি নেমে গেল, কিন্তু সাহিত্যের রুচি অটুট রইলো, অথবা রাজনৈতিক-সামাজিক চিন্তাধারায় তার কোনো সর্বনাশী প্রভাব পড়লো না। হিন্দি ফিল্মের গান নিছক কোনো সময়ক্ষেপণসহায়ক অবয়ব নয়, এই মুহূর্তে মানুন বা না-ই মানুন, তার সঙ্গে জড়ানো বিশেষ-এক দর্শনের ইশারা। এই গানের প্রধান উপগুণ ঠমক, অনেকটা যেন রাস্তার কলে জল

নিতে এসে বস্তিবাসিনী নাগরিকা হঠাৎ আপনাকে তেরচা ক'রে চোখ ঠেরে গেল। এই চোখ-ঠারায় মাদকরা আছে, যে-মাদকতা পরিপার্শ্ব ভুলিয়ে দেয়, প্রাগ্‌রুচির ঐতিহ্য ভুলিয়ে দেয়, ইতিহাস ভুলিয়ে দেয়, স্বচ্ছ চিন্তার প্রকরণগুলিকে বিকল ক'রে দিয়ে যায়; গানের রুচিহীনতা ক্রমশ এক সার্বিক চিন্তাহীনতায় পরিব্যাপ্ত হয়ে আমাদের শ্বাস রোধ ক'রে দাঁড়ায়।

অতএব স্বাধীনতা দিবসই হোক, বাগ্‌দেবীর আরাধনাই হোক, অথবা আনন্দময়ীর আবাহনই হোক, আপনার-আমার কোনো আশা নেই; রবীন্দ্রনাথের গানের ভরসা রাখবেন না, ভরসা রাখবেন না যে হঠাৎ হয়তো অতুলপ্রসাদ বা দ্বিজেন্দ্রলালের গান লাউডস্পীকারে ভেসে আসবে, কিংবা নজরুলসংগীত, অথবা আরো-একটু অতীতে স'রে গিয়ে রামপ্রসাদী বা ঐ-ধরনের অন্যকিছু। পুজোপাবণ সার্বজনীন অনুষ্ঠানাদির পিছনে যে-অদৃশ্য হাত কাজ করছে তার নিধান অন্য: জ্ঞান থেকে অজ্ঞানে, জ্যোতি থেকে তমসায়, রুচি থেকে শ্লীলতাহীনতায়, স্বন্দর থেকে কদর্যে আমাদের পৌছুতেই হবে, অন্যথা দেশকে টিঁকিয়ে রাখা যাবে না, মহান নেতা-নেত্রীদের ভবিষ্যৎ বিপন্ন হবে। যেহেতু কেউ-ই আমরা দেশদ্রোহী হ'তে চাই না, জীবন দিয়ে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতায় সন্নত রাখতে চাই, আস্থন, দু-কান উজাড় ক'রে দম-মারো-দমে নিজেদের সমর্পণ ক'রে দিই, যে-মুহূর্তে ফিল্মিগানের বাঁশরি শব্দায়িত হয়ে উঠবে, গৃহকাজ তুচ্ছ-করা রাধার মতো, চলুন, সব-কিছু ঠেলে ফেলে দিয়ে লাউডস্পীকারের যমুনাতীরে ছুটে যাই।

যে-কোনো একটি নাম

ঘুরে-ফিরে সেই আদর্শবাদী ছেলেটির কথা মনে হয়।

যে-কোনো একটি নাম বেছে নিন। মৃণাল চাটুজ্যে কি প্রবাল সেনগুপ্ত অথবা ববি হোম। এরকম হাজার-হাজার ছেলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে কলকাতায়-বর্ধমানে-আসানসোলে-বাঁকুড়ায়-বহরমপুরে-জলপাইগুড়িতে-মালদহে-ডায়মণ্ডহারবারে। একটি নাম অন্য একটি নাম থেকে ভিন্ন নয়। তাদের বচনে-চিন্তায়-আবেগে মোটামুটি একই উচ্চারণ। বিশেষ-কোনো আদর্শবাদী ছেলের কথা বলছি না। তাদের যে-কোনো একজনের কথা বলছি। কারণ একজনের কথা বলা মানেই তাদের সকলের কথা বলা। তাদের একজন সবাই-কার প্রতিভূ, একজনের আদর্শের মধ্য দিয়ে সকলের সম্মিলিত আদর্শের উদ্বেগ উৎসাহ ভাষা খুঁজছে, খুঁজে পাচ্ছে।

আদর্শ, দেশকে ভালোবাসা, দেশকে ভালোবাসা মানে দেশের মানুষকে ভালোবাসা, দেশের মানুষ মানে দেশের অধিকাংশ মানুষ। যারা গরিব, নিরন্ন, খেতে-খামারে-কারখানায় পথিপার্শ্বে যারা ধুঁকছে, সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও যারা জাতীয় সম্পদের অধিকার থেকে বঞ্চিত, যারা নিরক্ষর, কর্মহীন, সুতরাং উপার্জনরহিত অবস্থা তাদের, অথবা ঈষৎ যা উপার্জন তা থেকে ক্ষুন্নিবৃত্তি অসম্ভব ; আদর্শ, সেই আদর্শবাদী ছেলেটি সর্বোত্তম-অর্থে পরম দেশপ্রেমিক, কিশোর বয়স থেকেই সে উপলব্ধি করেছে নিছক নিজেকে নিয়ে বেঁচে থাকার মতো ক্লেদাক্ত ব্যাপার আর নেই। সবাইকে নিয়ে বাঁচতে হবে, গোটা দেশের মানুষ বাঁচলেই তবে আসল-অর্থে আমার-তোমার বাঁচা, তাই সবাইকে নিয়ে বাঁচতে হবে। সেটা সম্ভব একমাত্র সমাজব্যবস্থাটা যদি বদলানো যায় তা হ'লেই, সমাজব্যবস্থা পাল্টাতে গেলে আদর্শে ঋদ্ধ থাকতে হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে আরো প্রয়োজন ত্যাগের, সংহতির, স্বার্থচিন্তা বিলোপ ক'রে অন্য-সকলের সঙ্গে মিলিত হয়ে জমাট আন্দোলন সঞ্চারের।

সেই আদর্শবাদী ছেলেটি স্বপ্ন দেখেছে, ভিয়েৎনাম-কাম্বোডিয়ার দৃষ্টান্তিত

স্বপ্নসাফল্যে শিহরিত হয়েছে। কল্পনাকে তা হ'লে আমাদের পৃথিবীতে টেনে নামানো যায়, ত্যাগের তেপান্তর পেরিয়ে তা হ'লে সত্যিই রূপকথার রাজ্যে পৌঁছনো যায়, পৃথিবীর অন্যত্র যা ঘটেছে-ঘটছে তা তো তা হ'লে আমাদেরও ধরা-ছোঁওয়ার মধ্যে। আদর্শবাদী ছেলেটি তাই সংকীর্ণ স্বার্থচিন্তা ভুলেছে, বাবা-মা-ভাই-বোনদের বুঝিয়েছে, সবাইকে আড়াল ক'রে বাঁচা সম্ভব নয়। সবাইকে জড়ো ক'রে বাঁচতে হবে। অতএব জোট বাঁধতে হবে। তৈরি হ'তে হবে। অত্যাচার-নিপীড়ন সহ্য করতে হবে। এক যুগ দুই যুগ — কিংবা আরো অনেক বেশি সময় ধ'রে — লড়াই করতে হবে। লড়াই ছাড়া বাঁচা যায় না, এগোনো যায় না, সমাজকে পাল্টানো যায় না, যে-স্বপ্নের পৃথিবীর কথা ভাবা হয় তাকে পেতে হ'লে আপাতত যুদ্ধ, সংগ্রাম, কিছু-কিছু মৃত্যু।

আদর্শবাদী ছেলেটি তত্ত্বকথা আউড়ে ক্ষান্ত থাকেনি। সে খেতে-খামারে-কারখানায় গঞ্জে-ঘাটে-বাজারে জনতার কাছাকাছি এসেছে। পাশাপাশি থেকে লড়াই করেছে, কারাবরণ করেছে, ফের উদার আকাশের নীচে বেরিয়ে এসে নতুন ক'রে প্রতিজ্ঞায় নিজেকে বিদ্ধ করেছে। এরই মধ্যে নানা উথাল-পাথাল ঘটেছে। সাক্ষী থেকেছে সে: সহকর্মীর অপমৃত্যু দেখেছে, গৃহস্থের খেত-খামার-ঘরবাড়ি জ্বলতে-পুড়তে দেখেছে। হামলাকে রোখবার উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ প্রস্তুতির প্রয়াসে নিয়োজিত হয়েছে, কোথাও-কোথাও সফল হয়েছে, হয়নি। কিন্তু মনোবল ভাঙেনি তার। তার স্বপ্ন উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়েছে প্রতি ঋতুতে।

সে হারিয়ে যায়নি, তার বন্ধুরাও যায়নি। শিবঠাকুরের আপন দেশে ছায়ার আড়ালে তাদের দিন সন্ধ্যালগ্ন, তাদের রাত অস্ফুট ভাষায় দিনকে স্বাগত জানায়। কিন্তু আপাতত প্রকৃতি অপ্রসন্ন। আবহ আচ্ছন্ন ক'রে জমাট অন্ধকার। এই অন্ধকারে সামনের দিকে কী আছে বোঝা যায় না। পরস্পরকে ঠাহর করা যায় না পর্যন্ত, মাঝে-মাঝে ঘোর লাগে, মাঝে-মাঝে আশঙ্কা হয়, হয়তো অন্ধকারই চির সত্য। অন্ধকার বড়ো সংক্রামক, নিশিতে-পাওয়ার মতো একবার ছেঁকে ধরলে ছাড়িয়ে আসা বড়ো দুরূহ। এই অন্ধকারের শিকার হই আমি-আপনি অনেকেই, অন্ধকারের বিক্রমের কাছে হেরে যাই অনেকে আমরা।

ঘুরে-ফিরে তাই সেই ছেলেটির কথা মনে পড়ে। আদর্শে অনড়, বিশ্বাসে স্থির, ধৈর্যে অবিচল। তার সাহসের আগুনে নিজেদের সেঁকে নিতে সাধ জাগে।

আমাদের ভয় যেন তাকে স্পর্শ না করে। তার অভয় যেন আমাদের উজ্জীবিত ক'রে যায়। সে অন্ধকার হনন করুক, হনন করুক, হনন করুক।

ভীরু আমরা, কাপুরুষ আমরা, কিন্তু সে যেন আমাদের কলঙ্ক থেকে বাইরে থাকে। ইতিহাসের ধারা মিথ্যে হবার নয়, তার উপর অনেক দায়িত্ব, আমরা অক্ষম, কিন্তু তাকে তো সাহসে-শৌর্যে-ত্যাগে অক্ষয় থাকতেই হবে। ইতিহাসকে পরম স্নেহে এগিয়ে নিয়ে যাবে সে। আমাদের ভীরুতার বাইরে থাকুক, কারণ তার সাহসই আমাদের বীর্য, সে যদি বিশ্বাসে অবিচল থাকে তা হ'লে আমরাও অচিরে পুনর্জিত স্বর্গের দ্বারে পৌঁছতে পারব।

সেই ছেলেটি একা নয়, আসলে সে প্রতিভূ, পৃথিবীর হাজার-হাজার সাহসী সেনানীর প্রতিভূ। আপাতত অন্ধকার, কিন্তু তাকে, তাদের কথা মনে ক'রে ভরসা পাই। বর্তমানের অশ্লীলতার বাইরে সে, তারা আমাদের হাত ধ'রে-ধ'রে পৌঁছে দেবে, সে, তারা আমাদের ফের সাহসী হ'তে শেখাবে।

সাহস ছাড়া তো ইতিহাস হয় না, মানুষের ইতিহাস আসলে সাহসের ইতিহাস।

আমাদেরই সন্তান-সন্ততি

আমাদেরই পুত্রকন্যা, ভ্রাতুষ্পুত্র-ভ্রাতুষ্পুত্রী। সারি-সারি সব বাঙালি নাম: কিষাণ চট্টোপাধ্যায় নয় তো ভারতী তরফদার অথবা সিরাজুল ইসলাম। আমাদেরই সন্তান-সন্ততি, বাঙালি স্বপ্নবিহ্বলতা তাদের চোখে অঞ্জন ছেয়ে এসেছিল। সবাই স্বপ্ন দেখেছিল তারা, দেশকে, সমাজকে মহত্তর, শ্রেষ্ঠতর করার স্বপ্ন। সবাই যে একই স্বপ্নের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়েছিল তা নয়। আমরা, বিশেষ ক'রে বাঙালিরা, একটু বেশিরকম সত্তা-সচেতন, আলাদা ক'রে ভাবতে-বলতে-করতে ভালোবাসি, আমাদের দেখা স্বপ্নগুলিও তাই পরস্পরের থেকে ঈষৎ আলাদা হ'তে চায়। কিন্তু সব স্বপ্নেরই নিহিত মর্ম মোটামুটি এক: যুগ-যুগ ধ'রে বঞ্চিত-লাঞ্ছিত যারা, তাদের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, এমন সমাজ গড়তে হবে যেখানে শোষণ নেই, অপশাসন নেই, সর্বস্তরের মানুষ সটান-সমান মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াবে, দেশের যা সম্পদ্ সবাই সমপরিমাণে ভাগ ক'রে নেবে।

এ-সব স্বপ্নের বিভঙ্গে আমাদের কারো-কারো সায় ছিল, পুরোপুরি না-হ'লেও ভাসা-ভাসা, কারো-কারো হয়তো আদৌ সায় ছিল না। স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করার উদ্দেশ্যে ইতস্তত যে-ধরনের পন্থা অবলম্বন করা হয়েছিল, তা অনেকেরই মনে বিবমিষার সঞ্চার করেছিল, আমাদেরই মধ্যে অনেকে ঘৃণায়-আতঙ্কে শিউরে উঠেছিলেন। এই অস্থির অবস্থায় আমাদের সন্তান-সন্ততিদেরই শুধু নয়, আমাদের নিজেদেরও বিভ্রম ঘটেছে। অনেক ক্ষেত্রে এমন হয়েছে রাজশক্তি দুরভিসন্ধি এঁটেছেন, নানা দানবীয় কাণ্ডকারখানা সংঘটনের অপবাদের বোঝা এই ছেলেমেয়েদের কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছেন দেশে চণ্ডশাসন, যা অভিযোগ করা হয়েছে তা খতিয়ে দেখবার সুযোগ একদিকে হ্রস্বপ্রাপ্ত, অন্য দিকে, ঐ ঘনঘটার মুহূর্তে যে-কোনো নিন্দাবাদ সাধারণ লোকে বিশ্বাস করতে প্রস্তুত। সংবাদপত্রে-বেতারে-বিধান পরিষদে-সংসদে-প্রকাশ্য সভায় দিনের-পর-দিন ধ'রে প্রচার চলেছে, মতিভ্রষ্ট ছেলেমেয়েরা, আমাদেরই আত্মজ, কত পিশাচমনা রক্ত-

লোলুপ-মনুষ্যত্ববর্জিত তা অহোরাত্র শোনানো হয়েছে আমাদের, প্রতিনিয়ত আমাদের সতর্ক করা হয়েছে, যে-সন্তান পশুবৃত্তি বেছে নিয়েছে, সে ত্যাজ্য, সন্তানের চেয়ে সমাজ বড়ো. অতএব আমরা যেন নিষ্করুণ হই।

আমরা পাষাণ হয়ে থেকেছি। বছরের পর বছর ধ'রে, বিনা বিচারে, কিংবা বিচারের ভণিতায়, আমাদের পুত্রকন্যাভ্রাতুষ্পুত্রভ্রাতুষ্পুত্রীরা কারারুদ্ধ, কেউ-কেউ দণ্ডপ্রাপ্ত ; কেউ-কেউ অন্ধকারে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। কারাকক্ষের অন্তরালে, অথবা কারাপ্রাচীরের বাইরেই, কোনো কুয়াশাচ্ছন্ন ঘটনায় কারো-কারো কাঁচা-সতেজ প্রাণ রাজশক্তি-নিয়োজিত ঘাতকের গুলিতে নিঃস্পন্দন হয়েছে। বিগত পাঁচ-ছ'বছর, ভয়ে হোক, অভিমানে হোক, অন্যমনস্কতাহেতু হোক, হৃদয়হীনতা-হেতু হোক, ভুল-বুঝেছি-ব'লে হোক, আমরা নীরবে থেকেছি, বিবেককে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি, সামান্যতম অস্বস্তি বোধ পর্যন্ত আমাদের হয়নি। এখানে-ওখানে একটি-দুটি বিক্ষিপ্ত প্রতিবাদধ্বনি শোনা গেছে, কিন্তু বহুর ঔদাসীন্যে তা অচিরে স্তিমিত হয়ে এসেছে।

আমাদেরই রক্তের উত্তরাধিকারী এরা। এদের ভুল-ভ্রান্তির দিকটাই কি শুধু দেখবো, ত্যাগের দিকটা নয়, আদর্শবোধের দিকটা নয়? আশঙ্কা হয়, আমাদের হিশেবে কোথাও চিড় ধরেছে। শহরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত তাকিয়ে দেখুন, অজস্র রাস্তার নাম, পার্কের নাম, সেতুর নাম: বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ, সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার, সূর্য সেন স্ট্রীট, অনিল রায় রোড, প্রীতিলতা ওহ্‌দেদার সরণি। এই-সব নামের উল্লেখে এখনো আমানের ধমনী চঞ্চল হয়, হঠাৎ চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর পিছনে চ'লে যাই আমরা, স্বগত প্রণাম জানাই পূর্ব-সূরীদের, যাঁরা স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই স্বপ্ন যাতে নিটোল-সুন্দর বাস্তব রূপ নিতে পারে তার জন্য সর্বস্ব বিসর্জন দিয়েছিলেন, অনেকে প্রাণটুকু পর্যন্ত। লক্ষ্যে অবিচল থেকেছেন, লোভমোহমাৎসর্যের হাতছানি উপেক্ষা করেছেন, দৈন্যে-দারিদ্র্যে-কৃচ্ছ্রে তাঁদের দিন অতিক্রান্ত হয়েছে, তাঁরা আমাদের নমস্য। দৈনন্দিনতার আরক্ত কোলাহলে তাঁদের কথা প্রায়ই ভুলেই থাকি, কিন্তু অবিমিশ্র অকৃতজ্ঞ নই আমরা, ঐ যে মাঝে-মাঝে বাসের গায়ে লেখা 'কুঁদঘাট থেকে বি-বা-দী বাগ' তা-ই প্রমাণ করে।

পূর্বসূরীদের ত্যাগকে যদি শ্রদ্ধা জানাতে পারি, সন্তান-সন্ততির ক্ষেত্রে অন্য সিদ্ধান্ত হবে কেন? কোন্ যুক্তিতে ত্যাগের দুই মাপকাঠি স্বীকার ক'রে নেবো? বিনাবিচারে, বিচারাধীন, দণ্ডপ্রাপ্ত যে-হাজার-হাজার যুবকযুবতী-কিশোর-

কিশোরী পাঁচ-ছ-সাত বছর ধ'রে কারাকক্ষের অভিশপ্ত অন্ধকারে দিন কাটাচ্ছে, সমস্ত অর্থেই তারা বিনয় বসু - বাদল গুপ্ত - দীনেশ গুপ্তের সাক্ষাৎ উত্তরাধিকারী, সূর্য সেন-প্রীতি ওহ্‌দেদার-সন্তোষ মিত্রের মতো তারাও স্বপ্ন দেখেছে, শুধু সময় যেহেতু কয়েক দশক এগিয়ে গেছে, তাদের স্বপ্নের প্রকৃতি একটু অন্যরকম; কিন্তু সে-স্বপ্ন বড়ো নিষ্কলুষ, স্বপ্নকে সত্য করার তাগিদে তাদের যে-ত্যাগ, তাতেও কোনো খাদ নেই।

তবে কি আমরা বাঙালিরা অন্য ধর্মে দীক্ষা নিচ্ছি? লেপে-মুছে দিচ্ছি আমাদের অতীতের ঐতিহ্য? একটু স্পষ্ট করে বলি। যারা কারার আড়ালে, তারা অনালোচিত থেকেছে, অথচ, গত কয়েক বছর ধ'রে আরেক শ্রেণীর যুবক-তরুণদের নাম হঠাৎ খবরের কাগজে ছাপা হ'তে শুরু হয়েছে, বেতারে ঘোষিত হয়েছে, লোকের মুখে-মুখে বলাবলি হয়েছে। ভুঁইফোঁড়ের মতো তাদের মঞ্চাবির্ভাব, তাদের বৈভবের অভাব নেই, মসৃণ-নিঃশব্দ গাড়িতে তাদের নগর-পরিক্রমা, বিমানযোগে দিল্লি পৌঁছে তারা সুনিবিড় সলাপরামর্শ করে, বিমান-রথেই তাদের রাশভারি প্রত্যাবর্তন, তারা ব্যস্ত, ব্যবসায়ীরা তাদের ভেট দিচ্ছে, খবরের কাগজে তাদের মস্ত-মস্ত বিবৃতি ছাপা হচ্ছে, সর্দিকাশি হ'লে তারা অতি-বিলাসী নার্সিং হোমে বিশ্রামের জন্য যাচ্ছে। তারা তরুণ অথচ তাদের জীবন-যাত্রায় কৃচ্ছ্রসাধনের লেশমাত্র নেই, কিন্তু কাগজে-বেতারে তাদেরই নাম মন্ত্রের মতো উচ্চারিত হচ্ছে, সারা দেশ যেন তাদের নিয়েই ব্যাপৃত। ত্যাগের যতগুলি সংজ্ঞা, তাদের আচরণ-বিচরণ সব-ক'টির পরিপন্থী, তবু তাদের নামই মুখে-মুখে ফেরে; যারা কারারুদ্ধ, যারা হত, মৃত, আদর্শনিষ্ঠাহেতু যারা সর্বস্ব বিসর্জন দিয়েছে, তারা বিস্মৃত। আমাদেরই সন্তানসন্ততি, অথচ ভুলে থেকেছি তাদের: এই গ্লানির শেষ নেই। দেশ ফের একটা ধাক্কা খেয়েছে, ফের অনেক কিছু উথাল-পাথাল। আমাদের, বিশেষ ক'রে বাঙালিদের, এবার নতুন ক'রে আত্মজিজ্ঞাসার সম্মুখীন হ'তে হবে। তারুণ্যকে নিশ্চয়ই বরণ করবো। তরুণদের হাতেই, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, ভুবনের ভার। কিন্তু যে-তারুণ্যকে সন্নত প্রণাম জানাবো, কী তার বংশপরিচয়? সে কি ঝকঝকে গাড়ি চড়বে, বিমানে-বিমানে খ্যাতির পিছনে ধাওয়া করবে, অভিজাত হোটেলে খানা খাবে, ব্যবসাদার-চোরাকারবারীদের প্রসাদে বাড়ি-ঘর গুছোবে? নাকি সে আমাদের পুরোনো সংজ্ঞায় আবার স্থিত করবে, ত্যাগ-আদর্শনিষ্ঠার ঐতিহ্য চেতনার সঙ্গে ফের ওতপ্রোত জড়াবে? কাকে বাছবো, তিতিক্ষার আগুনে

পুড়ে যে-সোনা অমলিন, তাকে, নাকি সস্তা-রাংতায়-মোড়া ইতর এক প্রস্তর-খণ্ডকে ?

এখানেও হয়তো দ্বন্দ্বের নিরসন হবে না। আইনের বর্ম প'রে বাঘা-বাঘা নীতিবিদ্‌রা ব'সে আছেন, তাঁরা হয়তো বলবেন, কোনো-কোনো পাপের ক্ষমা নেই, আমাদের পুত্রকন্যাভ্রাতুষ্পুত্রভ্রাতুষ্পুত্রীরা যে-বীভৎস অনাচারের জন্য দায়ী, ত্যাগেও তার স্খালন নেই। কিন্তু নীতিবিদ্‌রা বুকে হাত রেখে বলুন তো, ভারতী তরফদার - কিষাণ চট্টোপাধ্যায় - সিরাজুল ইসলাম প্রমুখের বিরুদ্ধে যে-অনাচারের অভিযোগ, তার চেয়ে হাজার গুণ গুরু অনাচার তাঁরা কি হালে অনুষ্ঠিত হ'তে দেখেননি, যে-অনাচারের হোতা, জাতির সম্ভ্রান্ততম বংশের সন্তান ?

কোন্ তুলাদণ্ড সঙ্গে নিয়ে আমরা বিচারের ভূমিকায় অভিনয়ে নামবো ?

অপরের সুযোগের মতো মনে হয়

জীবনানন্দের হঠাৎ একটি চমক-লাগানো পঙ্‌ক্তি : যুগে-যুগে মানুষের অধ্যবসায় অপরের সুযোগের মতো মনে হয়।

পূর্ব বঙ্গে মস্ত বড়ো রাজ্যবিপ্লব সংসাধিত হয়ে গেলো। পশ্চিম পাকিস্তানীরা বিতাড়িত, পূর্ব বঙ্গ স্বাধীন। বাংলা ভাষা উদ্ভাসিত গৌরবে প্রতিষ্ঠিত ; এই প্রথম, পৃথিবীর বুকের উপর চেতিয়ে-ওঠা, বাঙালিদের সার্বভৌম রাষ্ট্র। বাংলা, বাংলাদেশ, বাঙালি : পৃথিবীর সর্বত্র এই শব্দগুলি এখন পরিচিত অভ্যাসের মতো। ঢাকা আর সেই তিরিশ-চল্লিশ বছর আগেকার নিস্তরঙ্গ মফস্বল শহর নয়, ব্যাংকক-দিল্লি-টোকিও-ম্যানিলা-পিকিং-বুখারেস্তের মতো ঢাকা আস্ত-এক স্বাধীন দেশের রাজধানী. জেট প্লেন উঠছে-নামছে, নানা দেশের মন্ত্রী-শান্ত্রী-রাজদূত আসছেন-যাচ্ছেন, গমগমে ব্যস্ত-স্মিত চেহারা, বাংলাদেশ, স্বাধীন বাংলাদেশের স্বাধীন রাজধানী ঢাকা।

আমরা পশ্চিম বঙ্গের বাঙালিরা একপাশে পড়ে আছি। কিন্তু আমাদেরও বুক ভ'রে ওঠে। আমাদের ইতিহাস অন্য খাতে বইছে, আমাদের ভাগ্যের প্রবাহ অন্য নক্ষত্রমণ্ডলে আঁকিবুকি কেটে এগোচ্ছে, আমাদের সমস্যার চরিত্র স্পষ্টতই আলাদা। তবু, ভাবতে ভালো লাগে, অনুকম্পায় আমরা নন্দিত হয়ে উঠি, সীমান্তের ঐ প্রান্তে ভাষায়-চেতনায়-আবেগের বিভঙ্গে এত নিবিড় ক'রে আমাদের সঙ্গে জড়িত ছিল যারা সামান্য পঁচিশ বছর আগেও, তারা স্বাধীনতা-স্বাতন্ত্র্যে উদ্দীপ্ত হ'তে পারছে· এই গর্ব-গৌরবে আমাদেরও তৃপ্তি, আমাদেরও সুখ। আমাদের গান ওরা এখনো গাইছে, আমাদের কবিতা ভাগ ক'রে পড়ছে, আমাদের ভাষা ওরা চমৎকার ব্যবহার করছে, স্ব-ভূমিকে ওরা বাংলাদেশ ব'লে অভিহিত করছে, সে-দেশ স্বাধীন, সে-দেশকে সবাই কুর্নিশ করছে, খাতির করছে, খোশামোদ করছে, এই ঈষৎ দূর থেকে তাতে আমাদেরও আনন্দ। আমরা ও-দেশের প্রত্যক্ষ নাগরিক না-ই-বা হলাম, ওদের গৌরবে আমাদের গৌরব, ওদের সুখে আমরাও সুখী।

থেকে-থেকে শুধু একটি অন্য প্রসঙ্গ কাঁটার মতো বিঁধতে থাকে। গত পঁচিশ বছরে ঝাঁকে-ঝাঁকে শরণার্থীরা ও-বাংলা থেকে এ-বাংলায় এসেছে, ইতিহাসের নিয়ম মেনে নিয়েই এসেছে। পূর্ব বঙ্গের নিঃসহায় কৃষককুলের উপর দশকের পর দশক ধ'রে, প্রায় দুশো বছরের পরিমাপ জুড়ে, যে-শোষণ চলেছিল, তার বিস্ফারিত পরিণাম দেশভাগ। পূর্বপুরুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে শরণার্থীরা : দশ পুরুষের অপরাধের বোঝা সুদসমেত এই এক পুরুষে পরিশোধ করেছে। নিজেদের বিত্ত বিসর্জন দিয়ে এসেছে, বৃত্তি বিসর্জন দিয়ে এসেছে। ইতিহাসের ক্রীড়নক, তাদের জন্য কিছুই প্রস্তুত ছিল না সীমান্তের এদিকে। খোলা আকাশের নিচে, খোলা বস্তিতে, অযত্নে-দাঁড়-করানো নড়বড়ে উদ্বাস্তু কুটিরে, উদ্‌ভ্রান্ত, এলোমেলো শরণার্থীশিবিরে তাদের আশা-প্রেম-দুঃখ-জ্ঞান-বোধ-অনুভব-ক্রোধ-ধিক্কার-বিক্ষোভ রূপ পেয়েছে, অথবা পায়নি। এ এক আশ্চর্য ইতিহাস, পঁচিশ বছর ধ'রে এক কোটি - দেড় কোটি লোকের একটি গোটা সম্প্রদায় আস্তে-আস্তে যন্ত্রণায়-অভাবে-অভিজ্ঞতায় শ্রেণীচ্যুত হয়েছে ; সন্তান-সন্ততিরা হারিয়ে গেছে ভিড়ে, মহামারীতে কেউ-কেউ বিনষ্ট হয়েছে, কয়েকজন বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতে শিখেছে, অন্য কেউ-কেউ গুণ্ডা বা বেশ্যা হয়েছে, ওয়াগন ভাঙতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে মারা গেছে কেউ-কেউ, যারা টিঁকে আছে, কয়েকজন তাদের মধ্যে হয়তো ছুরি শাণ দিতে শিখেছে, নয়তো কলকাতার মলিন রাস্তায় ভিক্ষে করছে, নয়তো মলিনতর কেরানিগিরি, স্মৃতিহীন, পরিচয়হীন, অতীতহীন, আপাতত, সন্দেহ হয় এমনকি ভবিষ্যৎহীন, এক বিরাট গহ্বরে তাদের অবস্থান, তারা শ্বাস নিতে ভুলে গেছে।

পূর্ব বঙ্গ আজ স্বাধীন-সার্বভৌম, পুরো ১৯৭১ জুড়ে আমরা মুক্তি-ফৌজের শৌর্যের কথা পড়েছি-শুনেছি, ভারতীয় সেনাবাহিনীর সৌভ্রাত্রমূলক সহায়তার বিবরণও ফলাও ক'রে কাগজে ছাপা হয়েছে। কিন্তু যা আদৌ উচ্চারিত হয় না তা এই শৌর্যের প্রাক্-কাহিনী, নিজেদের জীবন দিয়ে, সত্তা দিয়ে, যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা দিয়ে পূর্বপুরুষের বহুযুগসঞ্চিত পাপের যারা প্রায়শ্চিত্ত করলো মাত্র দুই কুড়ি ও পাঁচ বছরের পরিসরে, কুশীলবের তালিকায় তাদের নামোল্লেখ দেখি না। নিজেদের সর্বস্ব দান ক'রে তারা পূর্ব বঙ্গে পটভূমি তৈরি ক'রে রেখে এসেছিল, সেই পটভূমিতেই, একের পর এক, তার পর অনেক নতুন ইতিহাস সংঘটিত হয়েছে গত পঁচিশ বছর ধ'রে, পূর্ব বঙ্গের অধিবাসীরা নিজেদের অভিজ্ঞতায়

যাচাই ক'রে নিয়েছে শোষণের চরিত্রলক্ষণ, শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে, ছিনিয়ে এনেছে স্বাধীনতা।

ইতিহাসের পাতায় জল্-জল্ ক'রে মুক্তিফৌজের নাম লেখা থাকবে, কিন্তু শরণার্থীশিবিরের নীরব নায়ক-নায়িকারা? যুগে-যুগে মানুষের অধ্যবসায় অপরের সুযোগের মতো মনে হয়। না ভারতবর্ষে, না বাংলাদেশে, এই পঁচিশ বছর ধ'রে কাতারে-কাতারে চ'লে-আসা শরণার্থীদের চরম আত্মত্যাগের কৃতজ্ঞতা-স্বীকৃতি দেখি। ইতিহাসের উচ্ছিষ্ট হয়েই তারা পড়ে রইলো একপাশে।

বাংলাদেশ স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র: এই ঘোষণায় তাদের স্তিমিত রক্তে হয়তো সামান্য কিছু দোলা দেবে। কিন্তু তা চকিত একটি খণ্ডিত মুহূর্তের জন্য: সঙ্গে-সঙ্গে তারা মুখ ফিরিয়ে নেবে, নিজেদের সংহত-তদ্গত করবে অন্যতর সংগ্রামের জন্য। এই সংগ্রামের প্রস্তাবনা আলাদা: এই আত্মত্যাগের ঋতু পেরিয়ে যে-নীল আকাশের প্রতিশ্রুতি, তাতে তাদেরই একচ্ছত্র অধিকার। বাংলাদেশ বেঁচে-বর্তে থাক্, আপাতত তাদের নিজেদের সমাজ-বিপ্লবের প্রসঙ্গ।

শুধু মাঝে-মাঝে খটকা লাগে। ইতিহাসের নিয়মগুলি এমন উটকো-অবুঝ কেন: যারা দীর্ঘ পঁচিশ বছর ভ'রে আত্মত্যাগে নিজেদের দীর্ণ করলো তাদেরই কেন আরো-এক যুগ—অথবা হয়তো আরো বেশি সময়—সাহসে-সংগ্রামে-তিতিক্ষায়-অধ্যবসায়ে পরিশুদ্ধ হ'তে-হ'তে যেতে হবে? এত পাপ জমা ছিল পূর্বপুরুষদের?

শিবে গুণ্ডা, শিবে গুণ্ডাই

শ্রেণীস্বার্থের ব্যাপার, মুনাফার ব্যাপার, সুতরাং বেশির ভাগ খবরকাগজে প্রসঙ্গটি চাপা পড়েছে ; তা ছাড়া, মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্তদের জন্যই তো খবরকাগজ ; গত দু-তিন বছরের তুলনায়, আপাতবিচারে, ভালো লোকদের প্রাণে ত্রাস-সঞ্চার করে এমন ঘটনা উপস্থিত অনেক কম ; সুতরাং একপেশে খবর ছাপালেও পত্রিকাগুলিকে এখনো তেমন অসন্তোষের মুখোমুখি হ'তে হচ্ছে না।

অথচ শ্রমিকাঞ্চলে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন, গ্রামে গিয়ে খেতমজুরদের চুপিসারে প্রশ্ন করুন, সন্ত্রাস-হামলাবাজি আসলে অনেক বেড়েছে ; যারা নেহাৎ সাধারণ লোক তাদের উদ্‌বেগ বেড়েছে, দুশ্চিন্তা বেড়েছে, তাদের উপর অত্যাচার বেড়েছে। এক ধরনের বর্গিবাজি চলছে, অথচ রাজনৈতিক আন্দোলন ঈষৎ দুর্বল হয়ে পড়ায়, তেমন সুষ্ঠু প্রতিবাদ পর্যন্ত ধ্বনিত হচ্ছে না, প্রতিরোধও স্তিমিত। মনে পড়ে, আজ থেকে ছাব্বিশ-সাতাশ বছর আগে, সেই ১৯৪৫-৪৬ সালে, কিছুদিন রাজনৈতিক কর্মীদের উপর গুণ্ডাদের হামলা হয়েছিল ; কিন্তু তখন যেন লোকের মনে সাহস ছিল অনেকটাই বেশি, কিংবা এমন হ'তে পারে গুণ্ডাদের বীভৎসতা এখন আরো বেড়েছে : অবস্থা এখন যতটা থমথমে, তখন যেন ততটা ছিল না। তা হ'লেও একটা মস্ত সংশয় থেকেই যায় : গুণ্ডাদের ভয়ে যদি এই ১৯৭২ সালেও এতটা জবুথবু থাকতে হয়, তা হ'লে বছরের পর বছর ধ'রে, দশকের পর দশক ধ'রে আন্দোলন-সংগঠন-সংগ্রাম ক'রে আখেরে কী লাভ হলো ? মানছি, গুণ্ডাদের সঙ্গে অনেক জায়গায় পুলিশের হাতসাফাই চলছে, তা হ'লেও পাড়ার পর পাড়া জুড়ে এমন বিস্তীর্ণ-বিস্তারিত অত্যাচার কী ক'রে সম্ভব ? তা হ'লে কি হঠাৎ মনোবল ভেঙে পড়েছে, যাদের কাছ থেকে সাহস আশা করি আমরা, তারা মুহ্যমান ?

অবশ্য অন্য দু-একটি ব্যাপার স্বীকার করতে হয়। রেখে-ঢেকে ব'লে লাভ নেই, বাংলাদেশের রাজনীতিতে বরাবরই গুণ্ডাবাজি খানিকটা প্রশ্রয় পেয়েছে। সেই চিত্তরঞ্জন দাশের আমলেও গুণ্ডাদের কিছুটা প্রতিপত্তি ছিল ; তারপর

সুভাষ বসু - যতীন সেনগুপ্ত যখন কংগ্রেসের দখল নিয়ে মারামারি করেছেন, দু-পক্ষেই গুণ্ডারা লাঠি সড়কি ঘুরিয়েছে, পরস্পরের সভাসমিতি বান্‌চাল করেছে। আরো পরে, বামপন্থীদের আভ্যন্তরীণ ভুল বোঝাবুঝির ঋতুতে, গুণ্ডাদের অবশ্যই কখনো-সখনো অবিমৃষ্যকারী তলব পড়েছে। কিন্তু, এই কিছুদিন আগে পর্যন্তও, গুণ্ডাদের বাহুবল-ব্যবহারের ব্যাপারে, একটি চরিত্রগত পার্থক্য ছিল। গুণ্ডারা গুণ্ডাই, তাদের মাথায় তুলে কেউ নাচতেন না; তারা বিচরণ করতো সাধারণত লোকচক্ষুর আড়ালে; রাজনৈতিক দলগুলি কালে-ভদ্রে হয়তো তাদের শরণ নিতো, কিন্তু নায়কের ভূমিকায় গুণ্ডাদের ভাবাই যেতো না। রাজনীতি, বিশেষ ক'রে বাংলাদেশে, আদর্শের ব্যাপার, চিন্তা-তিতিক্ষা-ত্যাগের ফলশ্রুতি, গুণ্ডারা মুখ নিচু ক'রে কোণে ব'সে থাকতো, মঞ্চের ত্রিসীমায়ও আসবার এখতিয়ার তাদের থাকতেই পারতো না।

মস্ত যা বিপ্লব ঘটে গেছে তা এই ব্যাপারে। গুণ্ডাদের গুণ্ডা বলার মতো সৎসাহস সবাই যেন হারিয়ে ফেলেছে। তারা মন্ত্রী হচ্ছে, মহাকরণে ব'সে আইনশৃঙ্খলার ভার নিচ্ছে, সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দলের কর্ণধার হচ্ছে, সার্বজনীন পূজাসমিতির সভাপতি কি সম্পাদক ব'নে যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথিতে ভাষণ দিচ্ছে, কলেজে কোন্‌-কোন্‌ ছেলেমেয়ে ভর্তি হ'তে পারবে, আর কারা-কারা বাতিল হবে, তা নির্ধারণ ক'রে দিচ্ছে। যাকে বরাবর শিবে গুণ্ডা ব'লে জেনে এসেছি, সে হঠাৎ ভোল না-পাল্টেই, শ্রদ্ধেয় শিবপ্রসাদবাবুতে পরিণত হয়েছে। সমাজতন্ত্রের বুলি আজ যে-কেউই কপচাতে পারে, শিবে গুণ্ডাও কপচাচ্ছে; প্লেনে চেপে দিল্লি যাচ্ছে, মাননীয়তর দেশনেতা-নেত্রীদের সঙ্গে ছবি তুলছে, সে-ছবি কাগজে ছাপা হচ্ছে। তার পর কলকাতায় ফিরে এসে হয়তো নিরীহ লোকদের ঘরবাড়ি জ্বালাচ্ছে, সাধারণ লোককে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করছে, প্রতি-পক্ষীয় একজন-দুজন রাজনৈতিক কর্মীকে অবলীলাক্রমে নিজের হাতে খুন করছে পর্যন্ত।

ভদ্দরলোকেরা, যারা একটু নিরুদ্বিগ্ন সিনেমা দেখতে ভালোবাসেন, লাল-ঝাণ্ডা-ধরা বজ্রমুষ্টির সারি দেখে ঘাবড়ে যান, তারা প্রথম দিকে শিবে গুণ্ডার কার্যকলাপে ভারি অভয় পেয়েছিলেন। খবরকাগজের পিছনে যাঁরা, তাঁদের প্রশ্রয়েই অবশ্য শিবে গুণ্ডা ফুলে-ফেঁপে উঠেছে; এবং খবরকাগজের প্রশস্তি-কীর্তনের মোহমুদ্গরে, ভদ্দরলোক-ভদ্দরমহিলারাও গুণ্ডাসম্প্রদায়কে পূজ্যপাদ দেবতার আসনে বসিয়েছেন। অবশ্য সব-কিছুর পিছনে কাজ করছে রাষ্ট্রশক্তি,

যে-শ্রেণীস্বার্থ রাষ্ট্রশক্তির গোড়ায়, সেই শ্রেণীস্বার্থের অঙ্গুলিহেলন। সমাজে নিম্নবিত্ত-বিত্তহীনদের সংগ্রামচেতনা যখনই বাড়ে, ক্রান্তির লগ্ন যখন সমাসন্ন ব'লে মনে হয়, যে-কোনো মুহূর্তে যখন বিস্ফোরণের সম্ভাবনা, শাসককুলের মরীয়া অবস্থা তখন। সামনের দিকে তাকিয়ে ভরসার কিছু চোখে পড়ে না, মজুররা ক্রমশই আরো শক্ত ক'রে জোট বাঁধছে, কৃষকশ্রেণী জমিদার-জোতদারের চোখরাঙানি উপেক্ষা ক'রে ক্রমশই পরস্পরের দিকে হাত বাড়াতে শিখছে, এদিকে নগরে-বন্দরে উতরোল আন্দোলন, অন্তর্নিহিত দ্বান্দ্বিকতার চাপে রাষ্ট্র-ক্ষমতা ভেঙে পড়ছে। পৃথিবীর অনেক দেশেই দেখা গেছে, এমন মুহূর্তে গুণ্ডাদের শরণ নিতে হয় শাসকসম্প্রদায়কে। শান্ত্রীসেপাই দিয়েও যে-প্লাবন ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হয় না, উৎকোচ-প্রলোভনেও যে-সংকল্প শিথিল ক'রে আনা যায় না, তাদের প্রতিহত করতে তখন ডাক পড়ে গুণ্ডাবাহিনীর: পুলিশ ও সৈন্যদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে, সুষ্ঠু পরিকল্পনা বিশদ ক'রে নিয়ে, গুণ্ডারা যুদ্ধক্ষেত্রে নামে।

আমাদের এই ভূখণ্ডে গত দু-তিন বছর ধ'রে তারা অবতীর্ণ। দীর্ঘদিন অনেকরকম তালিম দেওয়া হয়েছে তাদের, অনেকরকম ভেক ধরতে শিখেছে তারা। তা ছাড়া, এই প্রথম, সাফল্যের পূর্বপ্রাপ্য হিশেবে, তাদের প্রত্যক্ষ-ভাবে নেতারূপে বরণ ক'রে নেওয়া হয়েছে পর্যন্ত। গুণ্ডারা রাজা হোক ক্ষতি নেই, কিন্তু শ্রেণীস্বার্থ তো বাঁচবে।

এখন অবশ্য, অনেকেই দেখছেন, অঙ্ক মিলছে না। যে-ভদ্রলোকেরা নির্ঝঞ্ঝাটে বাড়ি ফিরে নিরুপদ্রব ঘুমের স্বপ্ন দেখছিলেন, তাঁরা আস্তে-আস্তে আরেক দফা ভয়ে নীল হয়ে আসছেন: শিবে গুণ্ডা শিবপ্রসাদবাবু সম্বোধনেই ঠিক পরিতৃপ্ত নয়, দিনের-পর-দিন তার দাবির পরিমাণ বেড়ে চলছে। মজুররা টিট, এবার তোফাসে কারখানা চালানো যাবে ব'লে যে-মালিকরা স্বপ্ন দেখ-ছিলেন তাঁদেরও জ্ঞানাঞ্জনশলাকা ক্রমশ উন্মীলিত হচ্ছে: গুণ্ডাদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার পর লাভের গুড়ে অনেকটাই বালি। জোতদারদের অভিজ্ঞতাও আস্তে-আস্তে একই খাতে বইতে শুরু করেছে; যদি ইতিমধ্যে না-ও ক'রে থাকে, মাত্র দু-একদিন এদিক-ওদিকের ব্যাপার।

অন্তত স্বল্পবিত্তশ্রেণীভুক্ত ভদ্রলোকদের এই অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে যাওয়ার দরকার ছিল। ক্রান্তির রঙ দেখে যাঁরা ভয় পান, নিজেদের শ্রেণীবিন্যাস যাঁরা চিনে নিতে অপারগ হন, কপালে দুঃখ আছে তাঁদের। গুণ্ডাদের টাকা খাইয়ে ইতিহাসের গতি আটকে দেওয়া চলে না, নিজেদেরই উদ্‌ভ্রান্তি বাড়ে।

গুণ্ডাশাহী আপাতত রাজনীতির মঞ্চে, সাহিত্যে, শিক্ষাক্ষেত্রে, নাটক-সিনেমার আরক্ত ভিড়ে। লোকের মনে এখনো ভয়; পিছনের পথে কী ছিল আদৌ আর মনে আনতে পারছে না; সামনের পথে কী আছে তা সাহস ক'রে ভাবতে পারছে না পর্যন্ত। যারা একটু বেশি ভয়-খাওয়া, গুণ্ডাদের কাছে নাক-খৎ লিখে দিয়েছে ইতিমধ্যে। কিন্তু এ-সমস্তই ইতিহাসের পাদটীকায় চিহ্নিত থাকে: সবাই সমান সাহসী হ'তে পারে না, কিন্তু পরম সংকটের মুহূর্তে কিছু লোককে সাহস দেখাতে হয়। এই দেশটা গুণ্ডাদের নয়, আমাদের; আমাদের কাব্য-সাহিত্যের ঐতিহ্য গুণ্ডাগিরির ঐতিহ্য নয়: শুভচিন্তার, সৎচিন্তার, সর্বহিতাহিতস্নাত চিন্তার ঐতিহ্য; আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে গুণ্ডাদের অন্ধকার সুড়ঙ্গে টেনে নিয়ে যেতে দেবো না, শিক্ষাকে-শিষ্টাচারকে-জ্ঞানপিপাসাকে আমরা নতুন ক'রে উজ্জীবিত করবো, করবোই; আমাদের আদর্শের আন্দোলনকে গুণ্ডারা হাজার ছুরি চালিয়েও জবাই করতে পারবে না, আদর্শে আমরা স্থিত থাকবোই, সে-আদর্শ আমরা প্রচার করবোই। ব্যক্তিপূজার মিথ্যা সম্মোহ না, মেকি বুলির নাগবন্ধন এড়িয়ে, সবাইকে খোলা আকাশের নিচে জড়ো ক'রে এনে, আমরা ফের সাহসে দীক্ষা নেবো।

একজনের সাহস থেকে আরেকজনের সাহস, এমনি ক'রে ফের হাজার-লক্ষ-জনের সাহস। একজনের রুখে-দাঁড়ানো থেকে হাজার-লক্ষ জনের রুখে-দাঁড়ানোর উপাখ্যান। আপাতত, অস্বীকার ক'রে লাভ নেই, বরং সমূহ ক্ষতি, সাহসে একটু ঘাটতি পড়েছে। সুতরাং একজন-একজন ক'রে, আমাদের সাহসে প্রত্যাবর্তন করতে হবে; পরস্পরকে সাহসের উষ্ণতা বিলোতে হবে। এক থেকে বহুর সাহস। এক থেকে বহুর আশা। ঘরে ফেরার মতো যে-আশা, নতুন ক'রে ঘর-বাঁধার জন্য প্রয়োজন যে-আশার। সাহস বাদ দিয়ে সমাজবিপ্লব পরাহত, আশা বাদ দিয়েও পরাহত। আপাতত পরস্পরের সাহসে সেঁকে নিতে হবে নিজেদের। পরস্পরের আশায়। এমনি ক'রেই, হঠাৎ একদিন পালাবদল।

খুব কি রোমান্টিক শোনাচ্ছে? বিশ্বাস করুন, আমি রোমান্টিক নই, ছা-পোষা; আপাতত-নিস্তেজ বাঙালি। কিন্তু শিবে গুণ্ডাকে শিবপ্রসাদবাবু আর বলতে পারছি না। মাননীয় মহাশয়-মহাশয়াদের স্তুতিপত্রসত্ত্বেও পারছি না। শিবে গুণ্ডার মধ্যে যাঁরা বাল্মীকিপ্রতিভা আবিষ্কার করছেন, তাঁদের দলে আমি নই, খুন ক'রে ফেললেও নই!

গরিবগুলি গেল কোথায় ?

ভীষণ সমস্যা, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির কর্ণধাররা, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলী, ভারত সরকারের দেখনেওয়ালা দপ্তর, সর্বত্রই দুশ্চিন্তার কালো মেঘ ঘন-পুঞ্জীভূত হয়ে এসেছে। হৈ রৈ কাণ্ড, এমন বিপদে কে কোথায় কবে এর আগে পড়েছে ?

সারা দেশে গরিব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ব্যাঙ্কগুলি মাথায় হাত দিয়ে বসেছে।

রঙ্গ নয়। মহা ঢক্কানিনাদসহকারে গত বছর মার্চ মাসে সরকার থেকে এক নব্যনীতি ঘোষণা করা হয়েছিল। ব্যাঙ্কগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছে ; অন্য আর সবার মতোই ব্যাঙ্কদেরও এখন থেকে ধ্যানজ্ঞানতপস্যা সমাজতন্ত্র কায়েম করা। যে ক'রেই হোক, ধনী ব্যবসায়ী-শিল্পপতি প্রমুখ যাঁরা এতদিন ব্যাঙ্কদের কাছ থেকে ঢালাও সুযোগসুবিধা পেয়ে এসেছেন, প্রায় না চাইতে লগ্নি, সুদের হার বিনীতভাবে কমিয়ে হিশেব করা, এবার তাদের দিন ফুরোলো। বড়ো-লোকদের ব্যাঙ্করা আর পরোয়া করবে না, এখন গরিবদের ঋতু শুরু হলো। এত-দিন ধ'রে যাদের অবহেলা করা হয়েছে, ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার দেওয়া হয়নি, ধার দেওয়া হয়নি স্রেফ এই কারণে যে তাদের জামানত দাখিলের ক্ষমতা নেই, ভূমিস্বত্ব নেই, শাঁসালো দলিল-দস্তাবেজ নেই, এবার প্রধানত তাদের ঘিরেই ব্যাঙ্কগুলির প্রকল্পপ্রজ্ঞানপরিচর্যা পল্লবিত হ'তে থাকবে। জামানতের প্রসঙ্গ ব্যাঙ্করা আর আদৌ তুলবে না, দলিল-দস্তাবেজের দিকে ফিরেও তাকাবে না, আপনি যদি বিত্তহীন মজুরচাষী হন, অথবা সামান্য শ্রমজীবী, কিংবা স্বল্পবিত্ত স্ব-নির্ভর কারিগর, নয়তো নিঃসহায় করণিক বা ঐ ধরনের কেউ, তা হ'লে আপনার জন্য ব্যাঙ্কগুলির তরফ থেকে সব-কিছু প্রস্তুত : মেঘ না চাইতে জল, আপনি ঈষৎ মুখ খোলবার আগেই শ্রাবণের ধারার মতো ব্যাঙ্কগুলির টাকা আপনার কাছে চ'লে আসবে।

এবং নামমাত্র সুদে। এই ব্যাপার নিয়ে মাঝখানে বেশ-কিছু আলাপ-আলোচনা হলো, গরিবদের কী ক'রে নিত্যনতুন সুযোগ ক'রে দেওয়া যেতে পারে

তা ভেবে অনুকম্পায়ীরা অনেক চোখের জল, মাথার ঘাম ব্যয় করলেন, অবশেষে সিদ্ধান্ত হলো প্রতি বছর রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি তাদের সামগ্রিক লগ্নির এক শতাংশের অর্ধেক গরিবদের মধ্যে বাৎসরিক চার শতকরা হারে বিলোবেন। বছরে পুরো লগ্নির অঙ্ক মোটামুটি যেহেতু চার হাজার কোটি টাকার মতো, প্রায় কুড়ি কোটি টাকা তা হ'লে এই স্বল্প হারে নিম্নবিত্ত-বিত্তহীনদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।

বিশ্বনিন্দুকরা অবশ্য এখানেই মুখ কোঁচকাবেন, এত বক্তৃতাদি দিয়ে তারপর গরিবদের জন্য বরাদ্দ পুরো লগ্নির মাত্র এক শতাংশের অর্ধেক, মাত্র কুড়ি কোটি টাকা? কিন্তু এতদিন তো কুড়ি কোটি টাকাও জুটছিল না, সুতরাং চেঁচামেচি না ক'রে আপাতত এটুকুতেই না হয় সন্তুষ্ট থাকা ভালো। কুড়ি কোটি টাকা এখন মাত্র চার শতকরা হারে সুদ দিলে মিলবে; সরকারি নতুন নীতি ঘোষিত হবার আগে তো গরিবদের দশ থেকে বারো শতকরা হারে ব্যাঙ্ক থেকে ধার করতে হতো; সব সময়, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সমস্ত নিয়মরীতি মেপে-জুখে না মেলাতে পারলে, দলিল-দস্তখৎ ইত্যাদি পেশ না করতে পারলে, তা-ও পাওয়া সম্ভব হতো না।

অতএব আপাতত খুশি থাকো। সরকার বিবেকবান। সস্তা হারে গরিবশ্রেণী সুদ পাবেন, কিন্তু হেজি-পেঁজি যে-কেউ নিজেকে গরিব ব'লে দাবি ক'রে ব্যাঙ্ক থেকে সস্তায় টাকা নিয়ে যাবে, তা হ'তে দেওয়া উচিত নয়। এই কারণে আরো ঘোষণা করা হলো, গ্রামাঞ্চলে যাঁদের বাৎসরিক উপার্জন বারোশো টাকা কিংবা তার কম, শহরাঞ্চলে উপার্জন দু-হাজার টাকা কিংবা তার কম, এমনধারা লোকেরাই স্বল্পহার সুদের বিনিময়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি থেকে টাকা ধার করার অধিকারী হবেন। উপার্জনের সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়া হলো, গ্রামে বা শহরে যাঁদেরই উপার্জন এই নির্দিষ্ট সীমার উর্ধ্বে, তাঁরা কুড়ি কোটি টাকার এক কণাও পাবেন না।

বড়োলোকেরা তা হ'লে জব্দ, গরিবদের জমানা তা হ'লে এবারে আগত। নতুনের কেতন উড়লো; আসুন, আমরা সবাই জয়ধ্বনি করি।

কিন্তু হঠাৎ বজ্রাঘাত। নব্যনীতি প্রবর্তনের পর বছর ঘুরে এসেছে। সালতামামি থেকে ধরা পড়েছে, সস্তা সুদে গরিবদের টাকা ধার দেওয়ার ব্যাপারটা আদৌ এগোয় নি। কোথায় কুড়ি কোটি টাকার মতো রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি থেকে লগ্নি করা হবে, আসলে হয়েছে মাত্র সত্তর লক্ষ টাকা, অর্থাৎ

এই ব্যাঙ্কগুলির সমগ্র লগ্নির '০২ শতাংশ, চার হাজার কোটি টাকা থেকে এমনকি এক কোটি টাকাও না, নেহাৎই সত্তর লক্ষ। এমন হ'লে সমাজতন্ত্রে পৌঁছতে তো অনন্তকাল লেগে যাবে।

কী ব্যাপার? এবংবিধ স্খলনের কী কারণ, লক্ষ্য থেকে ভীষণভাবে বিচ্যুত হবার কী হেতু? ব্যাঙ্কগুলিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, জবাবও মিলেছে। সব-কিছুর জন্য দায়ী ঐ যে উটকো নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয়েছে: সস্তা হারে সুদ পাবে এক-মাত্র তারাই যাদের উপার্জন শহরাঞ্চলে বছরে দু-হাজারের নিচে, গ্রামাঞ্চলে বছরে বারোশো টাকার নিচে।

ব্যাঙ্কগুলি গলদ্‌ঘর্ম হয়ে গেছে সারা দেশ চুঁড়ে, না-শহরে, না-গ্রামে, তারা কিছুতেই গরিবলোক খুঁজে বের করতে পারছে না। ওহে গ্রামবাসী, তোমাকে সস্তা হারে টাকা ধার দিতে চাই, কিন্তু তোমার বাৎসরিক উপায় কত? কী বললে, বারোশো টাকার বেশি? উঁহু, হলো না, তা হ'লে তোমার সস্তায় লগ্নি পাওয়া হলো না। ওহে নাগরিক, তোমাকেও সস্তা হারে টাকা ধার দিতে চাই, বলো তো তোমার বাৎসরিক উপার্জন কত? বলো কি, দু-হাজার টাকার উপর? তা হ'লে তো তুমিও বাদ প'ড়ে গেলে।

বুঝুন তো, ব্যাঙ্কগুলি কী গভীর ফ্যাসাদে পড়েছে। গড়প্রতি একজন ভারতীয়ের আয় বছরে নেহাৎই ছশো টাকা; হিশেবে ধরা পড়েছে, এই মাত্র কয়েক বছর আগেও, দেশের তিন-পঞ্চমাংশ মানুষকে গড়ে পঁয়তিরিশ টাকারও কমে প্রতি মাসে জীবিকানির্বাহ করতে হতো। কিন্তু হ'লে কী হবে, ব্যাঙ্কগুলি কিছুতেই গরিব খুঁজে পাচ্ছে না, সস্তা সুদে দরিদ্রশ্রেণীকে লগ্নি উপঢৌকন দিতে পারছে না, সমাজতন্ত্র ব্যাহত।

কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাঙ্ক দপ্তর বিচক্ষণ বুদ্ধিতেই তাই এখন সুপারিশ করেছে, গরিবের পরিভাষা বদলে দেওয়া হোক; গ্রামে বারোশো টাকার কম বার্ষিক আয়, শহরে দু-হাজার টাকার কম আয়, এই নিয়মখানা তুলে নেওয়া হোক; উপার্জনের কোনো ঊর্ধ্বসীমারেখা না-ই বা রইলো, অত খুঁতখুঁতানির কী দরকার; কারা-কারা সস্তা সুদে টাকা ধার করার যোগ্য ব্যক্তি, সেই বিচার ব্যাঙ্কগুলির উপরেই ছেড়ে দেওয়া হোক, আর দেখতে হবে না তা হ'লে: শুধু এক কুড়ি কোটি টাকা কেন, চার শতকরা সুদে দশ কুড়ি কোটি টাকা পর্যন্ত ব্যাঙ্কগুলি তখন বণ্টন করতে সক্ষম হবে, কারো বাবার সাধ্যি নেই সমাজ-তন্ত্রের গতি তখন রোধ করে।

সত্যিই তো, গরিবগুলি গেল কোথায়? গরিবদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তা ব'লে তো সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যকে জলাঞ্জলি দেওয়া চলে না। চার শতকরা সুদে ব্যাঙ্কগুলি তা হ'লে বরং শ্রীযুক্ত জাহাঙ্গীর টাটা কি শ্রীযুক্ত ঘনশ্যামদাস বিড়লাকেই টাকা দাদন দিক। এই প্রস্তাবের যারা বিরোধিতা করবে, তারা সমাজতন্ত্রের শত্রু, গণতন্ত্রের শত্রু, পুঁজিবাদের দালাল।

গিয়াছে দেশ

দেখে-শুনে থ' মেরে যেতে হয়। হাজার-হাজার ছেলে-মেয়ে—যাদের চোখে স্বপ্নের নীল, যারা দেশকে, সমাজকে নিটোল ক'রে গড়তে চাওয়ার অপরাধে অপরাধী—তাদের বছরের-পর-বছর ধ'রে নিবর্তক আইনে জেলে পুরে রাখা যায়, কিন্তু চোরাচালানকারীদের নাকি ঠিক যায় না। ফৌজদারি আইনের নানা ধারায় বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মীদের বছরের-পর-বছর বিনা বিচারে কয়েদ রাখা চলে, অপরাধ প্রমাণ করা সম্ভব না হ'লেও কোনো ক্ষতি নেই, এক ধারায় মামলা খারিজ হয়ে গেলে আরেক ধারার ছুতো ধ'রে আবার আটক করা চলে; জামিন পেলেও ক্ষতি নেই, এক দফার অভিযোগে জামিন পেলে আরো হাজার দফার অভিযোগ ফেঁদে ফের কয়েদ করা চলে। অথচ ফৌজদারি আইনের কোনো ধারায় কোনো মহামহিম শ্রীল শ্রীযুক্ত চোরাকারবারীকেই নাকি গ্রেপ্তার সম্ভব নয়। স্থতরাং, অনেক টালবাহানার পর, এবংবিধ মহারথীদের কয়েদ করার জন্য আলাদা অর্ডিনান্স জারি করা দরকার হয়ে পড়ে। যেদিন অর্ডিনান্স ঘোষিত হয়, সেদিন সন্ধ্যাবেলা খোদ প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশ্যে বিশেষ বেতার ভাষণ দেওয়া কর্তব্য ব'লে মনে করেন। কী ব্যাপার? আমাদের বৈজ্ঞানিকরা নতুন-কোনো পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটালেন কি? না, সেরকম কিছু নয়। সরকার চোরাচালানকারীদের বন্দী করার উদ্দেশ্যে বিশেষ অর্ডিনান্স জারি করছেন; সমাজতন্ত্রের পথে এটা আরো মস্ত নির্ভুল একটা ধাপ কিনা, প্রধানমন্ত্রী তাই সমগ্র জাতিকে জানিয়ে দিচ্ছেন যাতে তাঁরা এই কৃতকার্যের জন্য তাঁকে অভি-নন্দন জানাতে পারেন, জানিয়ে নিজেরা কৃতার্থবোধ করতে পারেন।

কোথায় এসে আমরা পৌঁছেছি? গুণ্ডাদের হাতে রাজ্যভার, চোরাচালান-কারীদের পদ-বিভঙ্গে ধরণীতল টলমল। ছ-সাত বছর আগেও যে-ব্যক্তি হয়তো সামান্য পকেটমার ছিল, চোরাচালানের প্রসাদে সে আজ কোটি-কোটি টাকার অধীশ্বর, সে খবরকাগজের লোক ডেকে গর্ব ক'রে বলে, শাসকদলের নির্বাচন তহবিলে তিন কোটি টাকা দান করেছে সে, কোই হরজ নেই, দরকার হ'লে

আরো সাত কোটি ঢালবে, প্রধান মন্ত্রীর সেই বিশ্বস্ত সহচর, কাপুর না কী যেন নাম, একবার এসে সখ্যভাব নিয়ে অনুরোধ করুক-না তাকে: এই ধরনের আস্ফালনের ঈষৎ প্রতিবাদ পর্যন্ত শোনা যায় না কোনো মহল থেকে। যদিই বা কোনো সরকারি বিভাগ থেকে সাহস জড়ো ক'রে মাঝারি-কোনো চোরাকারবারীর নামে মামলা রুজু হয়, এমন ধারাবলে যাতে কোনো জামিন সম্ভব নয়, কোন্ জাদুবলে বিচারকের আদালতে নালিশের ধারাবদল হয়ে যায়, মাস্তানসাহেব ছাড়া পেয়ে বুক ফুলিয়ে বেরিয়ে আসেন। কী বিচিত্র সময়ের উপকূলে উত্তীর্ণ আমরা, যাকে দাগী চোর ব'লে দেশসুদ্ধ লোক জানে, তার সর্দিগর্মি হ'লে বাঘা-বাঘা চিকিৎসকরা ঝটিতি পাশে এসে জড়ো হন, তার স্বাস্থ্যের সর্বশেষ হাল বর্ণনা ক'রে প্রহরে-প্রহরে বুলেটিন ঘোষিত হয়, মহানগরের সংগোপনতম, সম্ভ্রান্ততম নার্সিং হোমে সে-মাস্তানের চিকিৎসার সমারোহ চলে। অর্ডিনান্স জারি হবার পর অতি সন্তর্পণে তাকে যদিই বা গ্রেপ্তার করা হয়, সেই চোরা-চালানকারীকে আটক রাখার জন্য, হেজি-পেজি কোনো জায়গায় নয়, মহাত্মা গান্ধির স্মৃতিপ্লুত যারবেদা কারগারের নিভৃত-নির্জন কক্ষ উজ্জ্বল ক'রে সাজানো হয়। চোরাকারবারী মাস্তানরা কোথায় কী ভাবে আহারবিহারে রত তা প্রতিদিন সংবাদপত্রের প্রধান উপজীব্য হয়ে দাঁড়ায়।

গান্ধিজি থেকে মাস্তান বাহাদুর, দেশকে এ কোথায় টেনে নামানো হয়েছে? ভারতীয় ঐতিহ্যের বড়াই করি আমরা, আমাদের সুমহান্ সংস্কৃতির বাণী নক্ষত্রের কানে-কানে উচ্চারণ করতে সদা উদ্গ্রীব আমরা, আমরা আদর্শের কথা বলি, নীতির কথা বলি, ত্যাগের কথা বলি, ন্যায়ের কথা বলি, সত্যের কথা বলি। গান্ধিজির প্রদর্শিত পথ ধ'রে তারা এগোচ্ছেন, শত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও এগোচ্ছেন, সানুনাসিক উচ্চারণে এই কথা ব'লে-ব'লে নেতৃস্থানীয়রা কানে তালা ধরিয়ে দেন। বচন এবং ব্যবহারে দেখুন কী দুস্তর তফাৎ। মাস্তানরা আজ সমাজের চুড়োয়, চোরাকারবারীদের চোখরাঙানিতে মুখ্যমন্ত্রী-রাজ্যপাল-এমনকি খোদ দিল্লির রাজদরবার তটস্থ-সন্ত্রস্ত। চোরাকারবারী মহাজন তার ব্যবসার তদ্বিরে বিদেশে যাবে, পাসপোর্ট প্রয়োজন, সেই পাসপোর্টের দরখাস্ত, খোঁজ নিয়ে দেখুন, হয়তো সই করেছেন কোনো রাজ্যপাল; বিদেশে উড়ে যাবার মুহূর্তে বিমান বন্দরে মাস্তান সাহেবের যাতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা না হয়, সেজন্য ফোন ক'রে ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছেন স্বয়ং কোনো মন্ত্রী। কোনো আসনই আর শূন্য নেই, চোরাচালানের বীর এসে তা পূর্ণ করেছেন। মাস্তানরা আজ সমাজের শীর্ষে অধিষ্ঠান করছে,

কারণ নেতারা সেখানে তাদের চড়িয়েছেন। নেতৃস্থানীয়রা এমন অবস্থায় পৌঁছেছেন যে শত নিন্দাবাদেও তাঁদের চিত্তের অবৈকল্য নষ্ট হবার নয়। তাঁদের তস্কর ব'লে অভিহিত করুন, মাস্তানসখা আখ্যায় বিভূষিত করুন, তাঁরা কানে তুলো দিয়েছেন, পিঠে কুলো বেঁধেছেন, তাঁদের জীবনদর্শন স্বতন্ত্র। লোকে গাল পাড়ছে পাড়ুক, তাঁরা তো গদিতে সমাসীন আছেন, তাঁরা তো নিজেদের আখের গুছোচ্ছেন, তাঁরা তো মৌরসীপাট্টার ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছেন। লোকে অকথা-কুকথা বলছে, বলুক-না, বলতে-বলতে যখন মুখ ব্যথা হয়ে যাবে, নিজে থেকেই থামবে। আর যদি তেমন বাড়াবাড়ি শুরু করে, ফের একে-ওকে-তাকে জড়ো ক'রে ক্ষ্যাপাতে-তাড়াতে শুরু করে, তা হ'লে তো পুলিশ-শান্ত্রী আছে, ফৌজদারি আছে, নিবর্তক আইন আছে, ইতিমধ্যে নেতারা চোরাচালানকারী-দের ছায়ায় আরো নিবিড় হয়ে আসবেন।

চরিত্রহীন নেতৃত্ব, দেশকে, সমাজকে তাঁরা দু-হাতে টেনে বর্তমানের নরকে নামিয়েছেন, নিজেদের তাৎক্ষণিক স্বার্থের জন্য নীতি বিসর্জন দিয়েছেন, আদর্শ আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত। নেতারা উপস্থিত মুক্তপুরুষ; তাঁদের মনে ক্ষীণতম পাপ-বোধ নেই। নির্বাচন বৈতরণী যাতে টাকার ভেলায় উত্তীর্ণ হতে পারেন সেজন্য অসাধুদের কাছ থেকে হাত পেতে টাকা নেওয়া হয়েছে, প্রতিদানে মাস্তান-চোরাকারবারীদের স্বর্গসুখের ঢালাও ব্যবস্থার উপচার। মুখে সমাজতন্ত্রের বুলি, অথচ সর্বদা ভাবের ঘরে চুরি সংঘটিত হচ্ছে, কী ক'রে সমাজের দরিদ্রতমদের বঞ্চিত ক'রে স্বজনপোষণ সুচারুসম্ভব, সর্বদা সেই চিন্তা, এবং সেই চিন্তানুযায়ী কাজ। আপাতত সমাজ তাই করাল ব্যাধির কবলে। যেখানে নেতারা আদর্শবিচ্যুত, বিবেকহীন, অন্যে সেখানে কোন্ ছার। বিস্ময়বোধের ক্ষমতা পর্যন্ত এখন বিলুপ্ত। দুর্ভিক্ষের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেও তাই লুটের ভাগ নিয়ে বাগবিতণ্ডা। বিবেক যেহেতু শতধা খণ্ডিত ক'রে পুণ্যতোয়া নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে, এমনকি নিরন্ন মুমূর্ষুদের সঙ্গে বঞ্চনা করতে পর্যন্ত বুক কেঁপে ওঠে না। কাগজ খুলুন, পড়তে পাবেন চমকপ্রদ খবর—অমুক জেলায় দুর্ভিক্ষপীড়িতদের জন্য সরকারি লঙ্গরখানা খুলতে দেরি হচ্ছে, কারণ শাসক-দলের দুই শরিকে ঘোর ঝগড়া বেধেছে কোন্ দল লঙ্গরখানার তত্ত্বাবধানে থাকবে তা নিয়ে। বুভুক্ষুরা বাঁচে কি মরে তা উহ্য, কোন্ শরিক বেশি দাঁও মারার সুবিধেটা পাবে, তা-ই তো আসল প্রশ্ন।

সমাজতন্ত্রের প্রসঙ্গ আপাতত শিকেয় তোলা থাক্; রিক্ত আকাশের নিচে,

এই নিঃস্বতার লগ্নে সে-ভড়ঙের ভূমিকা অবসিত। সমাজতন্ত্রের লোক-ঠকানো প্রবচন নয়, বাসি মানবিকতার কথাই বলছি। বাইরে দুর্ভিক্ষের ঘনঘটা, নিজের আখের গুছোনোর নেশায় নেতৃস্থানীয়রা যদি তাঁদের ন্যূনতম কর্তব্য থেকেও বিচ্যুত না হতেন, তা হ'লে এই অবস্থায় পড়তে হতো না, ধানচাল এবং তৎসহ অন্যান্য পণ্যের দাম একটু কম ক'রে বাড়তো। গরিবরা অন্তত সামান্য-একটু খেতে পেতো, আজ তাদের এই হাটে-গঞ্জে-রাস্তায়-রেলের প্ল্যাটফর্মে সারিবদ্ধ বীভৎসতায় মরতে হতো না। দেশের হতভাগ্যতম সম্প্রদায় উপস্থিত মুহূর্তে ধুঁকে-পুকে মারা যাচ্ছে, তার কারণ দেশে ফসলের অভাব নয়। দেশে যা ফসল উৎপন্ন হয়, মিলে-জুলে তা দিয়ে আপামর সাধারণ সকলের খিদের অন্ন মেটানো সম্ভব। যা সম্ভব তা হয়নি, হ'তে পারেনি তার একমাত্র কারণ চোরাপথে সে-শস্য নেতাদের মিত্রপাত্রদের গুদোমে উধাও হয়ে গেছে, এবং মিত্রপাত্ররা একটু-একটু ক'রে বাজারে ছেড়ে সে-শস্যের জন্য যে-দাম হাঁকছেন তা দরিদ্র চাষী তথা ভূমিহীন মজুরের সাধ্যের বাইরে। সমাজতন্ত্র শিকেয় তোলা থাক্, নেতাদের কাছে আপাতত যুক্তকরে প্রার্থনা : দেখুন, যদি হারিয়ে-যাওয়া সেই বিবেককে, সামান্য কিছুক্ষণের জন্য হ'লেও, ফিরে পান; যারা খাদ্যের জন্য কাৎরাচ্ছে—মুখ থুবড়ে মারা পড়ছে—এক ছটাক ভাতের ফেনের কল্পনায় যাদের সমাজতন্ত্রের নীল স্বপ্ন এখন সমাহিত, তারা আপনাদের বিগলিত ভাষণে আস্থা রেখেছিল, তারা ভেবেছিল আপনারা আর-কিছু না-হোক, একটু দু-মুঠো ভাতের স্বাদ পৌঁছে দেবেন তাদের কাছে; আপনাদের অযুতগুণ সম্পদ্ বৃদ্ধি হোক, তাতে তাদের কোনো ক্ষোভ ছিল না, তারা শুধু সীমিত একটু ছায়া আশা করেছিল। নেতাদের কাছে নিবেদন : কয়েকটি পলের জন্য হ'লেও, চোরাকারবারী সুহৃদের ইষ্টচিন্তা স্থগিত রেখে, নিজেদের ম'রে-যাওয়া হেজে-যাওয়া বিবেককে আরেকবার জাগিয়ে তুলুন, আপনারা ব্যস্ত, আপনাদের মাস্তান-বন্ধুরা সমান ব্যস্ত, কিন্তু দেখুন, কয়েকটি মুহূর্তের জন্যে হ'লেও একবার চোখ ফিরিয়ে দেখুন, আপনাদের লোভ দেশকে, জাতিকে আজ কোন্ সর্বনাশের উপান্তে এনে হাজির করেছে।

কিন্তু নেতারা ব্যাপৃত, তাঁদের সময় নেই। সেই কবে, বহু দশক আগে, এক মহাশয় ব্যক্তি সখেদে গান বেঁধেছিলেন : গিয়াছে দেশ, দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ'। না-খেতে পেয়ে কাতারে-কাতারে দেশের লোক মারা পড়ছে, চোরাকারবারীরা প্রসাদের প্রাচুর্যে আরো চিক্কণ হচ্ছে, ফের মানুষ

হবার জন্ম কাকে আবার অনুরোধ জানাবো, শুনবে কে? জাতীয় আদর্শ দিশে-হারা কোথায় উদ্দাম ধাবিত, মহাত্মা গান্ধি থেকে মাস্তান বাহাদুর, মন্ত্রীরা আজ কাকে জীবনের ধ্রুবতারা ক'রে এগোচ্ছেন···

গিয়াছে দেশ, দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ'। যে-ভদ্রলোক এই গান বেঁধেছিলেন, বিচক্ষণ মানুষ তিনি, পঞ্চাশ বছরের উপর তিনি বিগত। তাছাড়া, এই গান এখন যারা উৎসাহভরে গাইতে লাগবে, কে জানে, হয়তো নিবর্তক আইনে তাদের পুরে রাখা হবে। দুর্ভিক্ষের শুভলগ্নে গীতাভ্যাস মহাপাতক, তাতে সমাজতন্ত্রের গতি বিক্ষিপ্ত-ব্যাহত হবার আশঙ্কা।

'জরুরি' অবস্থার ভাবনা

১

যা বলার অল্প কথাতেই বলা চলে।

আমি ভারতীয়, তথা বাঙালি, রবীন্দ্রনাথের দেশের মানুষ আমি। আমার চেতনায় রবীন্দ্রনাথ, আমি যে-ভাষায় ভাবনা ব্যক্ত করি, তা রবীন্দ্রনাথের একান্ত সৃষ্টি, যে-গান আমাকে উদ্বেলিত-অনুপ্রাণিত করে, তা-ও। এখান-ওখান থেকে যত প্রলেপই পড়ুক, ধুলোর আস্তরণ সরালে, আমার সত্তার গভীরে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা প্রোথিত। যত অহংকারই করি, রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে আমার কোনো পরিচয় নেই, তিনি আমাকে লালন করেছেন।

তিনি আমাদের চেতনা, আমাদের প্রাণ, আমাদের নিঃশ্বাস, আমাদের অভয়।

দু-দিন আগে যা অকল্পনীয়-অভাবনীয় ছিল, তা-ই ঘটেছে আমাদের দেশে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ স্বৈরাচারের শিকার হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ছাপানো নিষিদ্ধ হয়েছে এ-দেশে, ফতোয়া জারি হয়েছে বেতারে রবীন্দ্রনাথের অমুক-অমুক গান গাওয়া চলবে না। রাষ্ট্রাদেশ : রবীন্দ্রনাথের চেয়ে রাষ্ট্রাদেশ যেন বড়ো।

সুতরাং, যুদ্ধ আমাকে করতেই হবে। প্রাণের দায় এটা, বিবেকের দায়। যে-স্বৈরাচার আমার নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে দিতে চায়, তার বিরুদ্ধে আমার সংগ্রাম। ঈষৎ বেকায়দায় প'ড়ে সে-স্বৈরাচার হয়তো এখন ক্ষমাপ্রার্থী হবে, হয়তো এ-ও বলা হবে রবীন্দ্রনাথকে শৃঙ্খলিত করার প্রসঙ্গটি অনুমোদিত কর্মসূচীর ঠিক অন্তর্ভুক্ত ছিল না, অন্যমনস্কতাহেতু এই প্রমাদ ঘটেছে, ভবিষ্যতে আর ঘটবে না।

অবৈকল্যে স্থিত থাকতে হবে আমাকে। কোনো-কোনো অপরাধের ক্ষমা নেই, কোনো-কোনো অপরাধ সভ্যতার সংজ্ঞাকে স্তম্ভিত করে। পাশববৃত্তি পাশববৃত্তিই, অন্যমনস্কতাহেতু হ'লেও তাই। যে একবার পাশবতায় স্খলিত হয়েছে, প্রথাসিদ্ধ তার স্খলনপ্রবণতা।

আমি স্বাধীনতার স্বপক্ষে, জীবনের স্বপক্ষে, সভ্যতার স্বপক্ষে। অসুরবধ আমার ধর্মীয় কর্তব্য। যে-অনৃতভাষিণী বলেন, রবীন্দ্রনাথের গান-কবিতা বন্ধ ক'রে না-দিলে দেশের সাধারণ লোক দু-বেলা দু-মুঠো খেতে-পরতে পাবে না, তাঁকে প্রতিহত করতে হবে। তাঁর বিরুদ্ধে আমার যুদ্ধ। যতক্ষণ পর্যন্ত আমার বিবেক আছে, সেই যুদ্ধ আমাকে চালিয়ে যেতেই হবে, আমি যদি একা হই, প্রাবৃট আকাশের নিচে হু-হু উন্মুক্ত প্রান্তরে একা, তা হ'লেও।

এই যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ।

২

ভাষার ব্যবহার বড়ো গোলমেলে ব্যাপার। সাধারণ কথাবার্তায় আমরা প্রায়ই বলি, চোখের চামড়া নেই। লজ্জাহীন হয়তো বলা যায়, কিন্তু সেটা বড়ো পোশাকি-পোশাকি। চোখের চামড়া নেই-তে তৎসম তটস্থতা নেই, খাঁটি বাংলা, বাঙালি নিন্দাবাদ, আমরা যারা বললুম তাদের দিক থেকে যেমন প্রকাশের অস্পষ্টতা নেই, অন্য পক্ষে যিনি উদ্দীষ্ট তিনিও মালুম ক'রে নিলেন আমরা কী বলতে চাইছি, যে-বিশেষণে তাঁকে ভূষিত করা হলো, সেটা তিনি মানুন না-মানুন।

অথচ ইদানীং মুশকিল দেখা দিয়েছে। ব্যক্তি নির্বিশেষে সবাইকে – অর্থাৎ আমাদের বিবেচনায় যাঁরা কিনা বেহায়ার মতো কাজ ক'রে থাকেন, তাঁদের সবাইকে – লক্ষ্য ক'রে আর বোধহয় বলা চলবে না, চোখের চামড়া পর্যন্ত নেই। যেমন আমাদের দেশে নতুন নিধান হয়েছে প্রধান মন্ত্রীর 'পদমর্যাদা'কে সর্বদা মান্য করতে হবে, না-করলেই একুশে আইন। ব্যক্তি এবং সেই ব্যক্তি কর্তৃক অধিষ্ঠিত পদের মধ্যবর্তী ব্যবধানটির দৈর্ঘ্য অনুমান করা তেমন সহজ নয়। আমরা হয়তো প্রধান মন্ত্রীর কোনো ব্যক্তিগত ক্রিয়াকর্ম-আচরণের সমালোচনা করছি, কিন্তু তিনি স্বয়ং কিংবা তাঁর কোনো চেলাচামুণ্ডা উল্টা-বুঝলি-রাম হয়ে ধ'রে নিলেন প্রধান মন্ত্রীর 'পদমর্যাদা'র উপরে কটাক্ষ আরোপ করা হচ্ছে, আর যায় কোথায়, সঙ্গে-সঙ্গে হয়তো আমাকে-আপনাকে শূলে চড়াবার ব্যবস্থা করা হলো।

অতএব মুশকিল দেখা দিয়েছে। যেমন ধরুন কয়েক সপ্তাহ আগে বিশ্বভারতীর সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান মন্ত্রী এসেছিলেন, তিনি আবার বিশ্বভারতীর

আচার্যও বটেন। প্রধান মন্ত্রী একটি আবেগপ্লাবিত বক্তৃতা দিলেন, অনেক ভালো-ভালো কথা-ঠাসা বক্তৃতা। সমবেত সুধীমণ্ডলী-ছাত্রছাত্রী-পুলিশ-গোয়েন্দা-সান্ত্রী-মন্ত্রী তদ্গতমন হয়ে শুনলেন: রবীন্দ্রনাথের চিন্তার ধারায় আমাদের প্রতিদিন অবগাহন করা কর্তব্য, আমাদের চেতনায় রবীন্দ্রনাথের গান-কবিতা যেন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকে, এমন-ধারা নানা বাণীতে ছাতিমতলা গমগম ক'রে উঠলো।

ভালো-ভালো কথা সব, শুনলে কেমন উদাস-উদাস হয়ে যেতে হয়। প্রধান মন্ত্রী আরো যোগ করলেন, রবীন্দ্রনাথের সেই প্রার্থনার কবিতাটি, সেই যে গো, 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির', তাঁর প্রিয়তম, এমনকি তাঁর এক-একবার মনে হয়েছে, 'জনগণমন-অধিনায়ক' ভালো, কিন্তু 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য' যেন আরো ভালো, এটাকেই সুরে বসিয়ে আমাদের জাতীয় সংগীত ক'রে দিলে মন্দ হতো না; আমাদের ছেলে-মেয়েরা ঘুরে-ফিরে এই কবিতাটি যেন বার-বার আবৃত্তি করে; এই কবিতাটির আদর্শে তারা যেন প্রতিনিয়ত অনুপ্রাণিত হয়; এই কবিতা যেন তাদের চেতনায়-ধমনীতে মিশে যায়।

'শোন্ সাধুর উক্তি কিসে মুক্তি সেই সুযুক্তি কর গ্রহণ'। এখানেই মুশকিল হয়েছে। দেড় বছর হয়েছে কি হয়নি, প্রধান মন্ত্রী 'আপৎকালীন অবস্থা' ঘোষণা করলেন, অপশাসন পর্ব শুরু হলো। রবীন্দ্রনাথও শাসিত হলেন। কোনো বিশেষ-বিশেষ রবীন্দ্রসংগীত 'আকাশবাণী'তে গাওয়া বারণ হয়ে গেলো। রবীন্দ্রনাথের কোনো-কোনো কবিতাও সেই সঙ্গে পত্রপত্রিকায় ছাপানো নিষিদ্ধ হলো। এই সব গান গাওয়া হ'লে, ছেলে-মেয়েরা এই সব কবিতা পাঠ করলে, এখানে-ওখানে বিদ্রোহী-বিদ্রোহী ভাব জাগতে পারে, 'আপৎকালীন অবস্থা'র শ্মশান-শান্তি বিঘ্নিত হ'তে পারে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের গান বন্ধ করা হলো, স্তব্ধ করা হলো রবীন্দ্রনাথের কবিতার বাগাড়ম্বর, মানে প্রধান মন্ত্রীই করলেন। অন্য অনেক রবীন্দ্রনাথের গান-কবিতার সঙ্গে 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির'-ও জবাই হলো। ওসব প্রার্থনাটার্থনা বড়ো বিপজ্জনক জিনিশ। সাধারণ লোকে কী থেকে কী মানে ক'রে ফেলে, দরকার কী। সুতরাং প্রধান মন্ত্রীর কর্মচারীরা রাষ্ট্রদেশ ব'লে 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির'-এর সর্বত্র শিরশ্ছেদ করলেন।

সেই প্রধান মন্ত্রীই এবার শান্তিনিকেতনে এমন ভাব-বিহ্বল বক্তৃতা দিয়ে গেলেন, এমন প্রার্থনার কবিতা আর হয় না, আহা, ছেলে-মেয়েরা পড়ুক, বার-বার ক'রে পড়ুক, তাদের চেতনার-ধমনীর সঙ্গে এর বাণী মিশে যাক। কিন্তু,

তা হ'লে কী হয়, মুশকিল হয়েছে প্রধান মন্ত্রীকে উদ্দেশ্য ক'রে তো বলা যাবে না চোখের চামড়া পর্যন্ত নেই, বলা যাবে না বেহদ্দ বেহায়া। ব্যক্তি এবং পদের দ্বন্দ্বঘটিত সমস্যা আছে কিনা—আর আছে একুশে আইন।

কিন্তু অন্য যাঁরা আছেন, তাঁদের সম্বন্ধে তো অন্তত সেরকম কোনো বাধা নেই, সেই যাঁরা প্রধান মন্ত্রীকে এখনো বিশ্বভারতীর আচার্যপদে বহাল রেখেছেন, সেই প্রধান মন্ত্রীকে, যিনি রবীন্দ্রনাথের রচনা পত্রপত্রিকায় প্রকাশ নিষেধ ক'রে দিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথের গান যাঁর ফতোয়ায় 'আকাশবাণী'তে গীত হ'তে পারছিল না, সেই কপট রবীন্দ্রভক্তরা, যাঁরা এসব সত্ত্বেও, প্রধান মন্ত্রীর আশেপাশে দাঁড়িয়ে হাত কচলাচ্ছেন, প্রধানমন্ত্রীর ঈষৎ প্রসাদকণা কুড়িয়ে যাঁদের দিন কাটছে। তাঁদের তো বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় গাল পাড়তে কোনো বাধা নেই? কী বলবো তাঁদের: চোখের চামড়া নেই, দু-কান কাটা, নাকি আরো-ভয়ংকর কিছু?

মানবতা নিয়ে মাথাব্যথা

যদি শুনি কেন্দ্র মানবতা নিয়ে একটু বেশিরকম মাথা ঘামাতে শুরু ক'রেছেন, ভয় হয় আমার, ভয়ের কারণ আমাদের সাম্প্রতিক ইতিহাস। যে-ধনকুবের কারখানায় সবচেয়ে বেশি মজুর ঠ্যাঙান, তাঁকেও সন্ধেবেলা মহাজাতি সদন নয়তো কলামন্দিরে মানবতাবোধের উপর সারগর্ভ বক্তৃতা দিতে শুনেছি। যে-মহাজন গরিব চাষীর শেষ রক্ত চুষে নেন, তিনিও নাকি মানবতার পক্ষে। মানুষকে বাদ দিয়ে মানবতাবোধ মস্ত বিদেহী ব্যাপার। এবং তাতে সব চেয়ে উৎসাহী এমন-সব লোক, যাঁদের শূলে চড়ালেও সারা জীবন ধ'রে তাঁরা যে-অত্যাচার চালিয়েছেন তার অপনোদন হয় না।

মানবতাবোধ: কথাটা শোনায় প্রাজ্ঞ, কিন্তু রেখে-ঢেকে কিছু বলার সওয়ালই নেই এখানে, মানুষকে নিয়েই তো সব-কিছু, সাধারণ মানুষ, শ্রমজীবী মানুষ। শ্রমজীবী মানুষ সমস্ত সমৃদ্ধির আকর, সমস্ত সৃষ্টির উৎস, সমস্ত উৎপাদনের কেন্দ্রপুরুষ, অথচ সামাজিক অনাচারহেতু উৎপাদনে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার নেই, সে অধিকার বর্তায় যে-ভূস্বামী জমি দখল ক'রে আছেন তাঁর উপর, যে-ধনকুবের কারখানার মালিক তাঁর উপর, শ্রমজীবী মানুষ তাঁর শ্রমের ফল থেকে বিচ্ছিন্ন। মানবিকতাহীনতার এখানেই শুরু। এক দল খাটবে, আরেক দল সে পরিশ্রমের ফল ভোগ করবে, এর চেয়ে অমানবিক কিছু হতে পারে না।

সংঘবদ্ধ গণআন্দোলন, মজুরচাষীর আন্দোলন, কারখানার শ্রমিকদের আন্দোলন, মুদ্রাস্ফীতিতে-প্রায়-বিস্ফারিত-প্রাণ কেরানিদের আন্দোলন, সমস্তই মানবিকতার জন্য আন্দোলন। যে খেটে মরে তারও বাঁচার অধিকার আছে, সেই মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের চেয়ে মহত্তর কিছু হ'তে পারে না।

এই আন্দোলনের চাপে যাঁরা যুগ-যুগ ধ'রে শোষণ ক'রে এসেছেন, তাঁদের অধিকারের মাত্রায় কিছুটা টান পড়ে, তাঁদের পেলব সংস্কৃতির আচার-ব্যবস্থায় কিছুটা হয়তো পতন ঘটে। ধর্মঘট হ'লে ট্রেন-প্লেন চলাচলের ব্যাঘাত ঘটে,

রাস্তায় মিছিলের ভিড়ে গাড়ি এগোতে পারে না, ককটেলে পৌঁছতে দেরি হয়, কখনো-কখনো এমনও হয়েছে মজুরি-ঠকানো মালিক দপ্তরে ঘেরাও হয়েছেন, তাঁর অঙ্গ প্রক্ষালনে বাধা পড়েছে। সঙ্গে-সঙ্গে মহা সোরগোল প'ড়ে গেছে। খবরকাগজে রোষকষায়িত সম্পাদকীয় লেখা হয়ে গেছে, লক্ষ্মীছাড়া শ্রমিকশ্রেণীর সাধারণ মানবত্তাবোধ পর্যন্ত নেই।

কিন্তু মানবতাবোধ বিনিময়-প্রতিবিনিময়ের জিনিশ। যুগের-পর-যুগ ধ'রে যে-মানুষেরা অত্যাচারের শিকার হয়ে এসেছেন, তাঁরা একবার সংঘবদ্ধ হ'তে শিখলে কিছুটা প্রত্যাঘাত অনিবার্য। এডমণ্ড বার্ক বিলাপ করেছিলেন ফরাশি বিপ্লবীরা মারী আঁতোয়ানেত্তের সঙ্গে অমানুষিক ব্যবহার করেছিল। কিন্তু সম্রাজ্ঞী এবং তাঁর শ্রেণীভুক্তরা দেশের সাধারণ লোকের সঙ্গে বংশপরম্পরা যে-ব্যবহার ক'রে এসেছিলেন তা কতটুকু মানবিক ছিল, সেই প্রশ্নটাও তো সমান প্রাসঙ্গিক।

এবার যাঁরা মার্ক্সীয় জীবনদর্শনের নামে ঠিক নাক কোঁচকান না, তবু বলেন, ফলিত সাম্যবাদ বড়ো মারাত্মক ব্যাপার, তাঁদের প্রসঙ্গে আসি। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় মানুষ নাকি অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে পড়ে, সব-কিছু ছাপিয়ে রাষ্ট্রর প্রভাব, সাধারণ মানুষের সঙ্গে রাষ্ট্রশক্তির দৈনন্দিন আদানপ্রদানে প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কের ছায়া পড়ে। যে-রাষ্ট্রের ভূমিকা ছিল গোড়ায় সাধারণ মানুষের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত ক'রে তোলা, সাধারণ মানুষের সঙ্গে সেই রাষ্ট্রের সংযোগ ক্ষ'য়ে-ক্ষ'য়ে আসে, যে-রাষ্ট্র ছিল মানুষের মুক্তির প্রতিভূ তা পরিণত হয় এক প্রাণহীন স্বেচ্ছাচারী যন্ত্রে, সাধারণ মানুষ তলিয়ে যায়।

এরকম যে হয় না বা হ'তে পারে না, তা নয়। সাধারণ মানুষের ব্যথা-দুঃখবেদনাকে উপশম করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে যাঁরা ক্ষমতায় আসেন, জনসাধারণের সঙ্গে তাঁদের নাড়ির যোগ ক'মে আসা সম্ভব, ক্ষমতার দম্ভে তাঁদের মাথা ঘুরে যাওয়া সম্ভব। মানুষ যতদিন অপাপবিদ্ধতায় প্রত্যাবর্তন না-করতে পারছে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও এধরনের আশঙ্কা যথেষ্ট। শোষণহীন সমাজব্যবস্থায়, যে-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের আর প্রয়োজন থাকবে না, সবাই-সবাইকে সমান মর্যাদা দেবে, সেই পারিজাত মুহূর্তে পৌঁছবার আগেই অঘটন ঘটতে পারে, রাষ্ট্রিক কর্ণধাররা অমানবিক হয়ে যেতে পারেন।

এটা ঠিক দার্শনিক সমস্যা নয়, মানবচরিত্রের আচরণ-বিচরণ দার্শনিকতা পেরিয়ে আরো গভীরের ব্যাপার। চরিত্রের স্খলন-পতন যে হয়, হ'তে পারে,

এই স্বীকৃতি মেনে নিয়েই সে-সর্বনাশের নিরোধ সম্পর্কে চিন্তা কর্তব্য। পূর্ব ইওরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে যতটা নয়, চীনে তার চেয়ে অনেক বেশি এই সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামানো হয়েছে। লোভের উর্ধ্বে, স্বার্থচিন্তার উর্ধ্বে, আত্মম্ভরিতার উর্ধ্বে মানুষ কি পৌছতে পারবে, যদি পৌছতে পারে তাহ'লে কী সেই প্রকরণ যার সহায়তায় এই জাদু সম্ভবপর, এ-সমস্ত প্রশ্নের তাৎক্ষণিক কোনো উত্তর হয়তো নেই, কিন্তু উত্তরের সন্ধান প্রয়োজন। সেই সন্ধানের অধ্যবসায়ের চেয়ে মহত্তর বৃত্তি কিছু হ'তে পারে না।

অথচ দেখুন, এই অধ্যবসায়ের তাগিদে মাও ৎসে-তুং যখন প্রস্তাব করলেন, মাঝে-মাঝে রাষ্ট্রবৃক্ষে ঝাঁকুনি দাও, যে অনেকদিন জুড়ে রাষ্ট্রের ক্ষমতার হাল ধ'রে আছে, তাকে টেনে নামাও, মাঝে-মাঝে উথাল-পাথাল ঝড় বইয়ে দাও, নইলে এই রিপুর মো[illegible] মানুষ আবদ্ধ হয়ে পড়বে, কী সোরগোলই-না হলো সারা পৃথিবীতে, টিটিক্কার প'ড়ে গেল চারদিকে, বিদ্যাদিগ্‌গজরা স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্তে পৌছলেন, অমানবিক চীন আদিম অন্ধকারে ফিরে যাচ্ছে। ধনকুবেরেরা, নিদেনপক্ষে তাঁদের প্রসাদে যাঁরা স্ফীতোদর তাঁরা, মহাজাতি সদনে না কি কলামন্দিরে ভূরি-ভূরি বক্তৃতা দিলেন।

সুতরাং, আরেকবার বলি, মানবতা নিয়ে কোথাও-কোনো আলোচনার সূত্রপাত দেখলেই সন্দেহ হয় : সব মতলবের অন্ধিসন্ধি চট ক'রে বোঝা যায় না। মানুষকে অগ্রাধিকার দিতে হ'লে, দোহাই, অন্তত কলকারখানায় মজুর-ঠেঙানো বন্ধ রাখুন।

'ফ্যাসীবাদকে রুখতে হবে'

শিবপ্রসাদবাবু আপাতত ভীষণ ব্যস্ত, পাড়ায়-পাড়ায় ফ্যাসী বিরোধী সম্মেলন উদ্বোধন করছেন।

শিবপ্রসাদবাবু মানে শিবে গুণ্ডা। কালের হাওয়ার এমন গুণ, শিবে গুণ্ডারা সবাই ঘোরতর ফ্যাসীবিরোধী হয়ে গেছে। নিরপেক্ষ থেকে তাদেরও চিত্তে আর স্বখ নেই, হাজরা পার্কে, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে মহতী-মহতী সভা হচ্ছে, ফ্যাসীবাদকে যে-ক'রেই-হোক রুখতে হবে, রুখতে হ'লে পাইপগান চাই। স্বতরাং, কোন্ শিশু আজ এটা না বোঝে, যদি ফ্যাসীবাদের কালো হাতকে গুঁড়িয়ে দিতে হয়, যে-গভীর প্রতিক্রিয়ার ষড়যন্ত্র আমাদের গৌরবস্বষমামণ্ডিত গণতন্ত্রকে স্তব্ধ ক'রে দিতে চাইছে, তাকে প্রতিহত করতে হয়, শিবে গুণ্ডাদের চাই, চাই-ই চাই। শিবে গুণ্ডারা ফ্যাসীবিরোধী সম্মেলন উদ্বোধন ক'রে বেড়াচ্ছে।

সোভিয়েট দেশ থেকে শুভেচ্ছাবাণী আসছে, শান্তি কংগ্রেসের সর্বাধ্যক্ষ স্বয়ং উপস্থিত থেকে শিবে গুণ্ডার ফ্যাসীবিরোধী নির্ঘোষ বিগলিতচিত্তে শ্রবণ করছেন, শিবে গুণ্ডার পাশে ব'সে একই মঞ্চে স্বপণ্ডিত সাম্যবাদী অধ্যাপক, মজুরের-খালাসীর-কামারের একদা-জয়গান-গাওয়া কবি ধুরন্ধর, তদ্গতপ্রাণা-প্রগতিশীলা রবীন্দ্রসংগীতগায়িকা, তেভাগা-কাকদ্বীপের কিংবদন্তীপ্রখ্যাত অনেক-ত্যাগের-পোড়-খাওয়া কৃষক নেতা, অতীতের বহু ধর্মঘটের বিজয়ী বীর ট্রেড ইউনিয়ন নায়ক। কালের হাওয়ার গুণ, অথবা বলতে পারেন রাজত্বের গুণ। এই রাজত্বে বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিচক্ষণ উপাচার্য প্রাণের দায়ে শিবে গুণ্ডার গৃহিণীকে পি. এইচ. ডি. পাইয়ে দেন, প্রগতি নাট্য আন্দোলনের বাঘা-বাঘা প্রাক্তন পুরোহিতরা রবীন্দ্রসদনে সান্ধ্য অনুষ্ঠান ডেকে শিবে গুণ্ডাকে মানপত্র দান করেন, তাঁদের স্ত্রীরা বাঁ হাতের কড়ে আঙুল ছুঁইয়ে শিবে গুণ্ডার কপালে শ্বেত চন্দন পরিয়ে দেন; কামিনী-রজনীগন্ধার গন্ধে ক্যাথিড্রাল রোড ম'-ম' করে। শিবে গুণ্ডারা সবাই রাজা রানীমার এই রাজত্বে।

আত্মরক্ষা মহাধর্ম, সুতরাং নিজেরা যারা ফ্যাসীবাদী, গুণ্ডামি যাদের পেশারও বেশি, নেশা, তারাই যে ফ্যাসীবিরোধী মেলা সংগঠন ক'রে বেড়াবে তাতে তেমন আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ইতিহাসে এধরনের রগড় অনেক দেখা যায়। চোরের মায়ের বড়ো গলা, গণতন্ত্রকে টুঁটি চেপে হত্যা ক'রে তারপর গণতন্ত্রেরই জন্য মায়াকান্না কাঁদা, এ তো আকছার হচ্ছে : পরিহাস বিজল্পিতম্। এবং পাপিষ্ঠকে রে নরাধম ব'লে নতুন ক'রে গাল পেড়েও লাভ নেই। কিন্তু যে-নিখাদ সাম্যবাদীরা জেনে-শুনে আজ ফ্যাসিস্ট গুণ্ডাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন, গুণ্ডাদের আন্তর্জাতিক কল্কে-পাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন, সেই জ্ঞানপাপীর সম্প্রদায়কে কী বলবেন? এক হিশেবে পৃথিবীর ইতিহাস সত্যিই নতুন মোড় নিচ্ছে। সমাজতন্ত্রের ধ্বজাধারীরা বিশেষ-বিশেষ সংস্থানে ফ্যাসীবাদকে প্রত্যুদ্‌গমন ক'রে নিয়ে আসছেন, স্মিত হাস্যে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলছেন : স্বাগতম্, তোমাদের জন্য সব প্রস্তুত, তোমরা অত্যাচার করো, আমরা নীরব থাকবো, তোমরা রক্তের বন্যা বইয়ে দাও, আমরা দেঁতো হাসি হাসবো, তোমরা নরমুণ্ডমালিনী শ্মশানকালীরূপে বিরাজ করো, আমরা সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত হবো।

সমস্যা আসলে স্বাধীনতার, স্বাধীন মানসিকতার। সর্বহারাদের আন্তর্জাতিক সৌভ্রাত্র মস্ত গালভরা বুলি। আজ থেকে তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে, বিভিন্ন দেশের সাম্যবাদী কর্মীরা তাঁদের আন্তর্জাতিক দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। কিন্তু এই চেতনা উভপাক্ষিক না হ'লে মুশকিল। ইওরোপের অমুক দেশে শ্রমিককৃষকশ্রেণী নিজেদের বিপ্লবকে সফল করেছেন, বিপ্লবোত্তর পর্যায়ে এক আশ্চর্যসুন্দর মায়াবী পৃথিবী রচনা করতে সফল হয়েছেন, সে-পৃথিবীকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের সকলের, হানাদারদের হাত থেকে সে-পৃথিবীকে বাঁচাতে হবে, এ-অঙ্গীকার আমার-তোমার-সবাইকার। ভালো কথা এটা। তবে, পাশাপাশি, অন্য একটি প্রতীপ সত্যও আছে : আমাদের দেশের মজুরকৃষক-বিত্তহীনদের সংগ্রামে ইওরোপের সেই সুদূর দেশের নতুন সমাজ গড়নেওয়ালা-দেরও সমপরিমাণ সহানুভূতি দেখাতে হবে, আমাদের শত্রুপক্ষের সঙ্গে হাত মেলানো তাঁদের পক্ষে মহাপাতক।

এখানেই গোল বেধেছে। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে ছায়া পশ্চিমগামিনী, বিশেষত ঔপনিবেশিকতামনস্কতার ছায়া। নিজের দেশের মজুর-কৃষক-মধ্যবিত্তরা বাঁচুক-মরুক ক্ষয়বৃদ্ধি নেই, কারো-কারো প্রধান শিরঃপীড়া অমুক সমাজতান্ত্রিক দেশের পররাষ্ট্রনীতির নিহিত স্বার্থ বজায় রইলো কিনা তা নিয়ে। অমুক

সমাজতান্ত্রিক দেশের ইয়া-ইয়া সাম্যবাদী নেতৃবৃন্দ তাঁদের সংকীর্ণ জাতীয় স্বার্থে শিবে গুণ্ডা সম্প্রদায়ের নাটের গুরুর সঙ্গে এখানে হাত মেলাতে লজ্জা পান না, শিবে গুণ্ডার দল আমাদের মারুক-পেটাক-ধর্ষণ করুক তাতে তাঁদের ঈষদতম যায় আসে না। কিন্তু তাতে কী, স্বাধীন মানসিকতা যেখানে ব্যাহত, সাম্যবাদী চিন্তা সেখানে মর্ষকামে রূপান্তরিত। সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পারের সাম্যবাদী নেতারা যেহেতু বিধান দিয়েছেন শিবে গুণ্ডাকে সঙ্গে নিয়েই ফ্যাসীবাদ রুখতে হবে, দিনের শেষে ফ্যাসীবাদ রুখতে শিবে গুণ্ডাই ভরসা। আপাতত তাই ইতিহাসে অশ্লীলতার প্রলেপ, কালের হাওয়ার প্রতিবিপ্লবী হাহাকার।

এটা অশ্লীলতার ঋতু, অন্ধকারের ঋতু। তবে এই মুহূর্তে ভুলে-ভ্রান্তিতে-উৎকণ্ঠায় যতই দিন কাটুক, ইতিহাস শেষ পর্যন্ত উপস্থিত যারা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে তাদেরই সহায় হবে, দ্বান্দ্বিক নিয়ম মিথ্যে হবার নয়। হাত গুটিয়ে ব'সে থাকলে অবশ্য দ্বান্দ্বিক নিয়ম স্বয়ংক্রিয় হবে না, করুণ গলায় এ-আঁধার-হবে-ক্ষয়-গোছের কীর্তনকর্তনেও হবে না; কিছু পুরুষকারের বড়ো প্রয়োজন। আপাতত চোখের সামনে অভব্য অভিনয় চলছে, আপাতত হয়তো ভয়ংকর সাহসব্যঞ্জক কিছু করার নেই, সেটা হঠকারিতা হবে, কিন্তু অন্তত কিছু ঘৃণা পুষে রাখুন। শাক দিয়ে মাছ ঢাকা অর্থহীন অসাধুতা, সমাজে বিপ্লব আনতে হ'লে সর্বাগ্রে দরকার কিছু ঘৃণার মূলধনের, এই ঘৃণা থেকেই একদিন সাহসের অক্ষৌহিণী সৃষ্টি হবে।

দেখে শেখা, ঠেকে শেখা

চমকপ্রদ কথাবার্তা, মাননীয় ব্যক্তিরা বলেন, কাগজে ছাপা হয়, না প'ড়ে উপায় কী। 'জরুরি অবস্থা'-হেতু দেশের আর্থিক হাল নাকি পাল্টে গেছে, কৃষি-শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদন বেড়েছে, রপ্তানি বেড়েছে, বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় উপ্‌চে পড়ছে, জিনিশপত্রের দাম পড়েছে, অন্তত পড়েছিল। হালে দাম যে ফের বাড়ছে তা নাকি 'জরুরি অবস্থা' শিথিল করার ফলেই।

কাকতালীয়তা থেকে যাঁরা বাহবা কুড়োতে চান, তাঁদের সঙ্গে বিতণ্ডা পণ্ডশ্রম। বছর দেড়েক আগে বিশেষ ক'রে খাদ্যশস্যের দর কিছুটা নিশ্চয়ই কমেছিল, কিন্তু তা প্রধানত প্রকৃতিদেবী প্রসন্ন ছিলেন ব'লে। উন্নত বীজ-সার-সেচ ইত্যাদি ইদানীং চাষাবাদের মস্ত সহায়ক হয়েছে। তা হ'লেও আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত ফসলের পরিমাণ নবধারাজলের পরিমাণের সঙ্গে অচ্ছেদ্যসূত্রে জড়ানো। আমরা যেহেতু 'জরুরি অবস্থা' চাপিয়েছি, অতএব ঈশ্বর খুশি হয়ে আমাদের কর্ষণভূমি প্রসন্ন বর্ষণে সিক্ত করেছেন, এ ধরনের একটি তত্ত্ব দাঁড় করানো যায় অবশ্য, কিন্তু তার গোত্র অর্থনীতি নয়, স্রেফ টোট্‌কা।

শিল্পের ব্যাপারে হিশেবটা আরো বেশি গোলমেলে। রাষ্ট্রের হাতে যে-সমস্ত মৌল শিল্পের দায়িত্ব, যথা কয়লা-ইস্পাত-ভারি যন্ত্রপাতি, এই দেড় বছরে সে-সব ক্ষেত্রে সত্যিই উৎপাদন যথেষ্ট বেড়েছে। বেসরকারি ক্ষেত্রে কিন্তু সেরকম আদৌ হয়নি। শিল্পের প্রসারে সর্বশ্রেণীর লোকেরা যাতে সমান সুযোগ-সুবিধা পেতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে স্বাধীনতার পর নানা বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছিল। রাঘববোয়ালরা যাতে চুনোপুঁটিদের গ্রাস না-করতে পারেন সেজন্য এই কিছুদিন আগে পর্যন্তও একশো দফা সরকারি নিয়মকানুন ছিল, যেমন ছিল বিদেশী মূলধনের অনুপ্রবেশ সম্পর্কে। এখন সে-সব বালাই ঘুচেছে, শিল্পপতিদের প্রায় ঢালাও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, আপনারা যে যতটা পারেন, উৎপাদন বাড়িয়ে চলুন, কোনো বাধানিষেধ আরোপ করা হবে না। ফল হচ্ছে না তেমন। ইতস্তত উৎপাদনের কিছু প্রসার হয়েছে, কিন্তু সব

মিলিয়ে অবস্থা মুহ্যমান। শ্রমিক আন্দোলন স্তব্ধ, মজুরির হার নিগড়ে বাঁধা, ধর্মঘট নিষিদ্ধ, বোনাসের হাঙ্গামা বিলুপ্ত, তবু সরকারি হিশেবেই দেখুন, শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগ ক'মে আসছে। ১৯৭৫-৭৬ সালে আগের বছরের তুলনায় প্রায় এক-পঞ্চমাংশ কমেছে। একটু-আধটু উৎপাদন যা বেড়েছে তা প্রধানত শৌখিন বস্ত্রাদি-রেডিও-টেলিভিশন অর্থাৎ বিলাস-সামগ্রীর ক্ষেত্রে, নয়তো রপ্তানির উদ্দেশ্যে। উৎপাদন ধুঁকছে, বিনিয়োগও নেই, কর্মসংস্থানের সুযোগও তাই সারা দেশে সংকীর্ণতর। পাঁচ বছর আগে ৪৫ লক্ষ যুবকযুবতী এম্‌প্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের খাতায় নাম লিখিয়েছিলেন, সেই সংখ্যা এখন বেড়ে এক কোটিতে দাঁড়িয়েছে।

'জরুরি অবস্থা', শৃঙ্খলায় আবদ্ধ সারা দেশ, শ্রমিকদের মেরে-কেটে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব, চাহিদা থাক্ না-থাক্ সম্ভব, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের ক্ষেত্রে যেমন করা হয়েছে ; কয়লা-ইস্পাতের স্তূপ জমেছে, বিক্রি যদি না হয় না-ই বা হলো, ক্ষতির বহরটা সরকার পুষিয়ে নেবেন। কিন্তু শিল্পপতিরা অনুরূপ পথে যাবেন কেন, তাঁরা প্রথমেই লাভের অঙ্কটা কষবেন, চাহিদা না-থাকলে উৎপাদন বাড়ানোর প্রশ্ন ওঠে না, চাহিদা রুদ্ধগতি।

চাহিদা নেই, কারণ অধিকাংশ দেশবাসীর সংগতি নেই। বিগত এক দশকে কৃষির ক্ষেত্রে খানিকটা উন্নতি হয়েছে, দেশের কোনো-কোনো অঞ্চলে, যেমন পাঞ্জাবে-হরিয়ানায়, বিশেষরকমই হয়েছে। কিন্তু এই উন্নতিহেতু শ্রীসম্পদ্ যা বৃদ্ধি পেয়েছে তা বেশির ভাগই সীমাবদ্ধ থেকেছে বিত্তবান ভূস্বামীদের হাতে, সাধারণ খেতমজুর-ভাগচাষী-ছোটো চাষীর উপার্জনে তেমন হের-ফের হয়নি। অথচ জিনিশপত্রের দাম, চালডালতেলমশলাজামাকাপড় সব-কিছুরই দাম, দশ বছরে অন্তত দ্বিগুণ হয়েছে। নিছক খাদ্যের সংস্থান করতেই পয়সাকড়ি ফুরিয়ে যাচ্ছে, শিল্পজাত দ্রব্য কেনবার সামর্থ্য কোথায় ? শহরাঞ্চলেও একই অবস্থা। গত কয়েক বছরে কর্মসংস্থান বাড়েনি, যাঁরা কর্মরত তাঁদের উপার্জন এক-জায়গায় থমকে দাঁড়ানো, কিন্তু দাম হু-হু বেড়েছে, ক্ষুন্নিবৃত্তিতেই বেশির ভাগ পরিবারের সম্বল নিঃশেষ হচ্ছে, শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা তাই বাড়া সম্ভব নয়।

অবশ্য এই উক্তিতে একটু খাদ আছে ; যা বলছিলাম, কিছু-কিছু জিনিশের বিক্রি বেড়েছে, শৌখিন জামাকাপড়-রেডিও-রেডিওগ্রাম-টেলিভিশন-রেফ্রিজেরিটর, গ্রাম বা শহরে সামান্য যে-কয়েকজন হালে টাকা করেছেন, তাঁরা কিনছেন। এই শ্রেণীর জিনিশ যাতে আরো বেশি বিক্রি হতে পারে, সেজন্য

সরকার করের বোঝাও কমিয়ে দিয়েছেন। তাতে চাহিদা তথা উৎপাদন ছিঁটে-ফোঁটা বাড়ছে, একশো-দুশো লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে; সারা দেশের সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে এই বাড়ার পরিমাণ নগণ্য। শিল্পপতিরা মোটামুটি হাত গুটিয়ে আছেন। কিংবা সরকার যদি ভরতুকি দিতে রাজি থাকেন, তা হ'লে জিনিশপত্র বিদেশে রপ্তানির চেষ্টা করছেন। যেমন করছেন কয়লা-ইস্পাতের ক্ষেত্রে সরকার স্বয়ং। এ এক আজব ব্যাপার, আর্থিক প্রগতির সারাৎসার ইস্পাতের কাহিনীতে বিধৃত, ইস্পাতের ব্যবহারই কলকব্জা-যন্ত্রপাতি-শিল্পোৎপাদন প্রসারের মূল আধার, যত বেশি শিল্পোৎপাদন তত বেশি ব্যবসা-বাণিজ্য-কর্মযজ্ঞ, তত বেশি কর্মসংস্থান। অথচ এমনই দেশের হাল, আমাদের যৎসামান্য ইস্পাত উৎপাদনেরও পূর্ণ সুযোগ নিতে পারছি না। দেশে যেহেতু চাহিদা নেই, ইস্পাত বাইরে পাঠিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় করা হচ্ছে।

কিন্তু বন্ধ্যা এই সঞ্চয়। যদি এই সঞ্চয়ের সুযোগ নিয়ে বিনিয়োগ ঘটতো, বিদেশ থেকে যন্ত্রাদি এনে শিল্পের উৎপাদনশক্তি বাড়ানো যেতো, কর্মোৎসাহে গমগম করতো চারদিক, বেকার সমস্যা প্রশমিত হতো, সাধারণ লোকের পকেটে দু-পয়সা আসত, সেই পয়সা ব্যয়িত হতো জিনিশপত্র কিনতে, জিনিশপত্রের চাহিদা বাড়তো, আরো বিনিয়োগের প্রয়োজন হতো তা হ'লে, কর্মসংস্থান আরো প্রসার পেতো, দেশ দ্রুত সমৃদ্ধির দিকে এগোতো। তা তো হবার নয়, গোড়াতেই গলদ। আমাদের ধনবণ্টনে ঘোর অসাম্য, দরিদ্রতর শ্রেণীর নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, নতুন-নতুন জিনিশ কিনবেন কী ক'রে? অতি শাদামাটা কথা এটা, দেশের হাল ফেরাতে হ'লে সর্বাগ্রে গরিব তথা সাধারণ মানুষের হাতে কিছু বাড়তি টাকা পৌঁছোনো দরকার।

'জরুরি অবস্থা'য় হয়েছে কিন্তু ঠিক তার উল্টো। দফায়-দফায় যে-প্রতিজ্ঞাই ঘোষিত হয়ে থাক্‌-না কেন, সাধারণ মানুষের উপার্জন আপাতত সংকুচিত। 'জরুরি অবস্থা', কর্তৃপুরুষদের ক্ষমতার প্রসার, শিল্পপতি-ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের বর্ধমান আনন্দবোধ, লক্ষ্মীছাড়া কেরানিকুল-শ্রমিকরা আন্দোলনে সংঘবদ্ধ হ'তে পারছে না। ধর্মঘট নিষিদ্ধ কিন্তু ছাঁটাই নয়, মজুরি বাড়ানো বন্ধ কিন্তু মুনাফার বহর নয়। গ্রামাঞ্চলও সমান রাহুগ্রস্ত। গত দেড় বছরে, আন্দোলন যেহেতু রুদ্ধ, ভাগচাষীর ভাগ বাড়েনি, খেতমজুরের আয় বাড়েনি, বেগার-খাটা যা বন্ধ হয়েছে তা অতি সামান্য, এবং ভূমিসংস্কার, প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলেছেন, শ্লথগতি। সুতরাং আমরা যে-তিমিরে সে-তিমিরে। এ বছর খরা দেখা দিলে দাম ফের

ভয়ংকর চড়বে, সাধারণ লোকের সমস্ত সামর্থ্য খিদের খাবার জোটাতে ব্যয়িত হবে, শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা আরো-একটু কমবে, মন্দা অব্যাহত থাকবে, কর্মসংস্থানের সুযোগ আরো-একটু সীমিত হবে। 'জরুরি অবস্থা'র এমন কোনো অন্তর্লীন জাদু নেই যাতে এই সংকট প্রতিহত হ'তে পারে।

সাধারণ লোকে দেখে শেখে, ঠেকে শেখে। স্রেফ চমকপ্রদ কথাবার্তায়, আর যা-ই হোক, উদরপূর্তি সম্ভব নয়। সাধারণ লোকে অভিজ্ঞতায় দীর্ণ হয়ে, দু-দিন আগে কিংবা পরে, প্রশ্ন শুরু করবেই ; দেশে প্রচুর ফসল হয়েছে, কিন্তু আমি দিনমজুর, আমার তাতে কী লাভ, আমি কি দু-বেলা একটু বেশি খেতে-পরতে পারছি ; বৈদেশিক মুদ্রার প্লাবিত সঞ্চয় থেকে আমি বেকার যুবক, আমার কী লাভ, আমি কি কোথাও কাজ পাচ্ছি, 'জরুরি অবস্থা'র চাপে উড়ো জাহাজ ঠিক সময়ে উঠছে-নামছে, তাতে, আমি কেরানির বধূ, এমন কী চিত্তশান্তি লাভ করছি ? অর্থনীতির জাবর কেটে জীবনধারণ করি, কিন্তু মেনে নেওয়া ভালো, এ-সব প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই।

দাম কেন বাড়ে

বাজারে গিয়ে হতভম্ব হই, বাড়ি ফিরে বলি : জিনিশপত্রের দাম আরো বেড়েছে। ভুল বলি, জিনিশপত্রের তো হাত-পা নেই, তাদের দাম নিজের থেকে বাড়ে না, দাম বাড়ানো হয়। যাঁরা বিক্রেতা, তাঁরা বাড়ান, যাঁরা ক্রেতা, বেশি দাম দিয়ে কিনতে বাধ্য হন। অনেক ক্ষেত্রে দাম বাড়ার যথার্থ কারণ থাকে অবশ্য। যে-গরিব বিধবা শাকের ঝুড়ি মাথায় চাপিয়ে শহরের বাজারে এসে বিক্রি করেন, চালের দর চড়লে তাঁকে দুটো বাড়তি পয়সা দিতে আমাদের কারো আপত্তি হবার কথা নয়, তাঁকেও তো বাঁচতে হবে। সারের খরচ বাড়ে, সেচের খরচও, কিংবা মজুরির হার, আনুপাতিক হারে পণ্যশস্যের দামও তাই বাড়ে। অথবা এমন হয় তুলোর দাম বাড়ে, সুতরাং কাপড়ের দামও। আর মন্দার বছর যেহেতু ফসল কম হয়, জোগান কম, যাঁদের ট্যাঁক ভারী, বাড়তি কড়ি ফেলে তাঁরা সেই যোগানের বৃহদংশ নিজেদের দিকে টানতে চান, বাজারে দাম তাই হু-হু ক'রে বাড়ে, সাধারণ গৃহস্থের নাভিশ্বাস।

এই কারণগুলি বোঝা যায়, যা যায় না তা যোগানের আপাতপ্রাচুর্য সত্ত্বেও দামের হঠাৎ লাফিয়ে-লাফিয়ে বাড়া। উৎপাদনে ঘাটতি নেই, আমাদের প্রায়-স্বয়ম্ভর হবার উপক্রম, অথচ দাম বেড়েই চলে। এ সব ক্ষেত্রে, আরেকবার বলি, দাম বাড়ে না, বাড়ানো হয়। কেন বাড়ানো হয় সোজা হিশেবেই তা ধরা পড়ে। ধরুন এ বছর সারা দেশে গমের উৎপাদন তিন কোটি টন। পুরো উৎপাদনের সবটা অবশ্য খোলা বাজারে আসে না, হয়তো অর্ধেকটা আসে, অর্থাৎ দেড়কোটি টনের মতো। কিলো-প্রতি হয়তো দু-টাকা দরে আমি-আপনি গম কিনতে অভ্যস্ত। কিন্তু মজা হলো, কেউ চোখ টিপে দিলেন, অথবা রাতের অন্ধকারে ক হয়তো খ-র সঙ্গে কী নিভৃতালাপ করলেন, দাম লাফিয়ে দু-টাকা দশ পয়সা হলো। প্রতি কিলোয় দশ পয়সা দাম বাড়লে এক টনে বাড়ে একশো টাকা, মূল্যবৃদ্ধিহেতু দেড়কোটি টন থেকে বাড়তি উপার্জন তা হ'লে দেড়শো কোটি টাকা। আমি-আপনি এই টাকাটা দিলাম, শেঠজীরা পেলেন। কিংবা

ধরুন বাজারে চিনি কিনছেন তিন টাকা কিলোয়। ফের কেউ চোখ টিপে দিল, একলাফে দাম চার টাকায় চড়লো। কিলো-প্রতি এক টাকা দাম বাড়লে টন-প্রতি এক হাজার টাকার বাড়তি মুনাফা। যেহেতু ৪৫ লক্ষ টনের মতো চিনির বাৎসরিক উৎপাদন সারা দেশে, দাম বাড়ার ফলে চিনি থেকে বাড়তি রোজগার হলো চারশো কোটি টাকা : শিল্পপতি-ব্যবসায়ীরা পেলেন, আমরা দিলাম। অথবা ধরুন সরষের তেল ছিল সাত টাকা. এক ধাক্কায় দাঁড়ালো তেরো টাকায়। যদি সরষের তেলের উৎপাদন দশ লক্ষ টন ধরা হয়, তা হ'লে এই ভেল্কিবাজি থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যবসাদাররা ছ-শো কোটি টাকা বাড়তি আয় করবেন। আমরা সবাই দিলাম, তাঁরা পেলেন।

সরকারের তূণে অনেক বাঘা-বাঘা অস্ত্র আছে, সরকার তা হ'লে এ ধরনের মূল্যবৃদ্ধি দৃঢ়হস্তে কেন রোধ করেন না? অতি সরল প্রশ্ন, যা সেই বাচ্চা ছেলেটির গল্প মনে করিয়ে দেয়। ছ-বছরের শিশু সদ্য স্কুলে ভর্তি হয়েছে। এক গাল হাসি নিয়ে স্কুল থেকে বাড়ি এসেছে, ক্লাসের পরীক্ষায় অঙ্কে শূন্য পেয়েছে, মা প্রশ্ন করেছেন, তুই শূন্য পেলি, দিদিমণি রাগ করেননি? বালকের বিস্ময়মিশ্রিত উত্তর : বাঃ রে, উনি রাগ করবেন কেন, উনিই তো শূন্য দিলেন। দাম বাড়ার ব্যাপারটাও, খোলাখুলি বলা ভালো, অনেকটা সেরকম। সরকার দাম বাড়া বন্ধ করবেন কেন, বহুক্ষেত্রে, প্রত্যক্ষভাবেই হোক বা পরোক্ষ-ভাবে, সরকারই তো দাম বাড়ান। যাঁরা সরকার চালান, তাঁরা ধোওয়া তুলসী-পাতা নন, তাঁরা রাজনীতি করেন ক্ষমতায় আসার জন্য, ক্ষমতাসীন হয়ে দেশের-দশের একটু-আধটু যা ভালো করেন, তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি চেষ্টা করেন আপনজনদের অবস্থা ফেরাবার। নিন্দা-প্রশংসার প্রসঙ্গ এখানে উহ্য, রাজনীতির ধর্মই এটা। দাম বাড়লেও অনেক সময় তাই চুপ করে থাকতে হয়, যাঁরা দাম বাড়াচ্ছেন তাঁদের কাছ থেকে ক্ষমতাসীন দল হয়তো অতীতে কিছু সুবিধা পেয়েছেন, ভবিষ্যতে হয়তো আরো পাবেন। শেঠজীরা গমের দাম বাড়িয়ে একশো কোটি টাকা বেশি পেলেন, কিংবা চিনির দাম বাড়িয়ে সাড়ে চারশো কোটি টাকা, অথবা সরষের তেল থেকে ছ-শো কোটি টাকা। রাতের অন্ধকারে শেঠজীরা এই টাকার খানিকটা — দশ-বিশ-পঁচিশ কোটি — হয়তো ক্ষমতাসীনদের চাঁদা দিয়ে দিলেন, কিংবা দিলেন যাঁরা শীগগির ক্ষমতাসীন হ'তে পারেন তাঁদের, কিংবা দু-তরফকেই, এঁদের একটু বেশি, ওঁদের একটু কম। দাম বাড়লো, আপনার-আমার টাকা শেঠজীর পকেটের গহ্বরে বিলীন হলো। রাজনৈতিক

দলের ভেট মিললো, নেতারা, মন্ত্রীরা ময়দানের সভায় মহা হম্বিতম্বি করলেন, যারা দাম বাড়ালো সেই হতচ্ছাড়া অসামাজিকদের পিটিয়ে ঢিট করবেন, চাঁদের আড়ালে অলক্ষ্য দেবতা মুচকি হাসলেন। সম্ভবত এটাই নিয়ম, পৃথিবীতে সম্ভবত কোনো বিশুদ্ধ দেশ নেই, কোনো দেশ নেই যেখানে রাজনীতি অর্থকলুষাক্ত নয়। কিন্তু আমাদের দেশে বিগত কয়েক বছরে আরো-কিছু ভয়ংকর ঘটনা ঘটেছে। রাজনৈতিক দল অবলীলাক্রমে টাকা করছে। শেঠজীরা আপনার-আমার পকেট কেটে যে-টাকা করছেন, তার থেকে একটা অংশ চাঁদা হিশেবে খুশি মনে ক্ষমতাসীন দল কিংবা ক্ষমতায় আসতে পারেন এমন দলকে দিচ্ছেন। রাজনৈতিক দলের অর্থসাচ্ছল্য বড়ো মারাত্মক ব্যাপার। টাকা আছে, খরচ করতে হবে। দলটি ক্ষমতাসীন ব'লেই, অথবা দলটির ক্ষমতাপ্রাপ্তি আসন্ন ব'লেই, এত টাকা হয়েছে, অন্যথা হতো না। সুতরাং চিরকালই যাতে ক্ষমতাসীন থাকা যায় সে-উদ্দেশ্যেই টাকাটা খরচ করা বিধেয়। ক্ষমতাসীন থাকতে হ'লে নির্বাচনে জিততে হবে। দেশের আর্থিক অবস্থার সার্বিক উন্নতি ঘটলে এমনিতেই ক্ষমতাসীন দল সাধারণ লোকের সমর্থন পাবে, নির্বাচনে জয়ী হবে। কিন্তু তা তো হচ্ছে না, আর্থিক প্রগতি দুরূহ সম্পাদ্য, তার জন্য বিরাট কর্মযজ্ঞ প্রয়োজন, ভূমি-সংস্কার প্রয়োজন, শিল্পবিপ্লব প্রয়োজন, বণ্টনব্যবস্থা ঢেলে সাজানো প্রয়োজন। অত-শত অল্প সময়ের মধ্যে ক'রে ওঠা সাধ্যের বাইরে, কী জানি হয়তো ইচ্ছারও বাইরে। সুতরাং তেমন-কিছু আর্থিক উদ্যোগ হয় না, বেকার সমস্যা বাড়ে, সাধারণ গৃহস্থের মনে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়। অথচ নির্বাচনে জিততে হবে। তাই প্রচারের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অবস্থাবিশেষে প্রয়োজন হয়ে পড়ে কিছু-কিছু লোকপীড়নের, কোথাও-কোথাও ত্রাসসঞ্চারের। তরুণরা দেশের শক্তির উৎস, যেহেতু আর্থিক মন্দা, তাদের কাজ দেওয়া যায় না, কিন্তু শেঠজীরা যে-চাঁদা দিয়েছেন তার থেকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে-বিলিয়ে কিছু সংখ্যক তরুণকে হাতে রাখা সম্ভব। তাই সার্বজনীন পুজোর সংখ্যা ও সৌষ্ঠব বছরে-বছরে বাড়ে, ছেলেরা হাতখরচের টাকা পেয়ে খুশি থাকে, হিন্দী ছবি দেখে, মাদক চাখে, পাড়ায়-পাড়ায় দলের প্রতাপ অটুট রাখতে সচেষ্ট হয়। ছেলের দল নেমকহারাম নয়। ফেলো-কড়ি-মাখো-তেল এই আদর্শে তারা অবিচল। যেই দল টাকা ঢালতে সমর্থ তার জন্য তারা তদ্গতপ্রাণ।

বাজারে দাম বাড়ে, শেঠজীরা টাকা করেন, রাজনৈতিক দলের ভাণ্ডার উপচে পড়ে, নির্বাচনের মুহূর্তে ছেলের দল জিপে-গাড়িতে চেপে নিশান হাঁকিয়ে

এপাড়া-ওপাড়া-বেপাড়া দলের জন্য জান কবুল ক'রে দেয়। তাদের বিধাতা নগদনারায়ণ। দেশে কেন কর্মোদ্যোগ নেই, তাদের কেরানি বাবা কেন সংসার চালাতে হিমসিম, তার ভাই পাস ক'রে কেন কোনো কাজ পাচ্ছে না, শহরের উপকণ্ঠের কারখানাগুলি কেন বন্ধ, জিনিশপত্রের দাম কেন বাড়ছে, এ-সব হেঁজি-পেজি সমস্যা নিয়ে তাদের মাথা ঘামানো নেই। রাজনৈতিক দাদারা শেঠজীর কাছ থেকে টাকা পেয়ে তাদের দিচ্ছেন, তারা কৃতজ্ঞ দাদাদের কাছে। দাদারা যে-দলভুক্ত সেই দলের কাছে। সেই দলের জন্য তারা প্রাণ দিতে প্রস্তুত, এমন-কি প্রাণ নিতেও।

সুতরাং বাজারে দাম যে বাড়ে এবং নির্বাচনে প্রার্থী দাঁড়িয়ে কারো মাথা যে ফেটে চৌচির হয়, এই দুইয়ের মধ্যে একটি কার্যকারণ সম্পর্ক আছে। কিন্তু এই ডামাডোলে সেই ব্যাখ্যা শুনতে ক'জন উৎসুক?

পালাবদলের পরে

বহু বছর আগে কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় হাল্কা চালের একটি কবিতা লিখেছিলেন, যার প্রধান পুরুষ জমিদারবাবুর দারোয়ান, যে দেউড়িতে পাহারায় থাকে, খৈনি খায়, ঘাসে লাঠি ঠোকে। জমিদারবাড়ির অন্দরমহলে যে-সমস্ত চমকপ্রদ ব্যাপার-স্যাপার ঘটে, যেমন ধরুন জমিদারনন্দিনী কার সঙ্গে পালিয়ে যায়, দু-দিন বাদে ফিরে আসে, তার প্রত্যাবর্তনের আনন্দে জমিদারবাবু মস্ত পার্টি দেন, তাতে প্রচুর ঢলাঢলি হয়, এ সমস্ত-কিছুতে দারোয়ানের ভূমিকা : ইসমে হমার কী, হম জমিদারবাবুকা দরোয়ান, দেউড়িমে থাকি। লঘু মেজাজের কবিতা, কিন্তু, এখন মনে হয়, এক মস্ত দার্শনিক-রাজনৈতিক সত্য তাতে যেন বিজ্ঞাপিত হয়েছিল। রাজধানীতে পালাবদল হলো, রাষ্ট্রপতিভবনের অশোককক্ষে নতুন প্রধান মন্ত্রী - অন্যান্য মন্ত্রীরা শপথ গ্রহণ করলেন, রাতারাতি 'আকাশবাণী'-'দূরদর্শনে'র ভোল পাল্টে গেল, দীর্ঘ তিরিশ বছর বাদে শাসনক্ষমতায় অন্য দল সমাসীন। আপাতবিচারে প্রায় সর্বসম্মত অভিমত, যা ঘটলো তুলনা নেই, সর্বশক্তির আকর দেশের কোটি-কোটি সাধারণ মানুষ, পুরোনো শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার-অনাচারে তিতিবিরক্ত হয়ে ভোটের মারফত অত্যাশ্চর্য বিপ্লব ঘটিয়ে দিলেন, সারা পৃথিবী তাজ্জব ব'নে গেল, এমনটা যে হ'তে পারলো তা আমাদের ধমনীতে-শিরায় গণতান্ত্রিক চেতনা স্পন্দিত হচ্ছে ব'লেই, যে যত অপচেষ্টাই করুক, স্থূলে আমাদের ভুল নেই, আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজত্বে।

তাই কি? বাসে বাদুড়ঝোলা হয়ে যে-কেরানি অফিসে যাচ্ছেন, মাথায় দেড়মণি ঝাঁকা-বওয়া মুটেমজুর, কাঠফাটা রৌদ্রে গ্রামের মাঠে কর্মরত অর্ধভুক্ত মুনিষ, পাটকল থেকে ছাঁটাই-হওয়া শ্রমিক, এঁদের সবাইকে জিজ্ঞাসা করুন। দিল্লিতে কী ঘটলো না-ঘটলো তা বড়ো বেশি সুদূর, খুব কম লোকেরই বিশ্বাস আছে রাজধানীতে যে পালাবদল হলো তাতে তাদের নিজেদের অবস্থার সামান্যতম হেরফেরও হবে। তবু তারা অনেকেই লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিয়েছে, প্রতি পাঁচ (না কি এখন ছয়) বছর অন্তর তারা ওই একবার রাজা। বিশেষ

ক'রে এবার শরীরে-মনে বিশেষ-একটা রাগ পোষা ছিল, ভোটের বাক্সের মধ্য দিয়ে তারা সেই রাগ প্রকাশ করেছে: আমরা ধুঁকছি ধুঁকবোই, ডুবছি ডুববোই, কিন্তু তোমাদের তো একবারের মতো অন্তত শিক্ষা দিয়ে নিই।

গত সপ্তাহে, যখন ভোটের খবর বেরোলো, সাধারণ মানুষ দুটো দিন প্রচুর আনন্দ পেয়েছে, বিমল আনন্দ, যে-লক্ষ্মীছাড়ার দল ভীষণ বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল, তাদের ধুলোয় টেনে নামানো গেছে তা হ'লে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। মুটেমজুরকে অথবা রিকসাওয়ালাকে কিংবা গ্রামের মানুষকে ডেকে প্রশ্ন করুন, তাদের মনে সত্যিই আর-কোনো আশা-আকাঙ্ক্ষা নেই, দিল্লিতে নতুন যে-সরকার গঠিত হলো তাতে তাদের কী, তাদের দুঃখদুর্দশা, সাধারণ লোকে ধ'রেই নিয়েছে, কোনোদিন উপশম হবার নয়। বেকার যুবকের সঙ্গে কথা বলুন, আপনার বুদ্ধিহীনতা তার কৃপার উদ্রেক করবে, কারণ সে বরাবরই জেনে এসেছে, নির্বাচনে রাজা বদল হয়, কিন্তু শোষণের পরিমাণ কমে না, কমলেও মাত্র কয়েক দিনেব জন্য, তার পর যে-কে-সেই। দৈনন্দিন অভাবের তাড়নায় ভ্যাবা-চ্যাকা-খাওয়া নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করুন, রাজধানীর উত্থানপতন তাঁকে সেই দেশজ প্রবচনই মনে পড়িয়ে দেয়: নাচে কারা? তারা-তারা।

এই থমথমে নৈরাশ্য অযৌক্তিক নয়। রাজ্য সরকার মাঝে-মাঝে মস্ত-মস্ত ফিরিস্তি প্রচার ক'রে থাকেন, পশ্চিম বঙ্গে পাঁচ বছর ধ'রে কী ভীষণ-ভীষণ সব কাজ হয়েছে। ছিঁটেফোঁটা যে হয়নি তা নয়, কিন্তু সার্বিক সমস্যাদির গন্ধমাদন একচুলও নড়েনি তাতে। রাজ্য সরকার ভালো কি মন্দ সেই প্রসঙ্গ উত্থাপনেরও দরকার নেই। পশ্চিম বঙ্গের আর্থিক দুর্গতি ঘোচানো রাজ্য সরকারের সাধ্যেরই বাইরে। একটি-দুটি উদাহরণে এই ঢালাও মন্তব্যের সমর্থন মিলবে। অপরিসর পশ্চিম বঙ্গে কৃষির উন্নতি ঘটাতে হ'লে সবচেয়ে আগে প্রয়োজন সেচব্যবস্থা সম্প্রসারণের, সেচের ব্যাপ্তি না-হ'লে বছরে একাধিক ফলন সারা রাজ্য জুড়ে অসম্ভব। এই একাধিক ফলনের ব্যবস্থা করতে পারলে, ভূমিসংস্কার হোক কি না-হোক, ছোটো চাষী তথা খেতমজুরের অনেকটাই সংগতি হতো। অথচ পশ্চিম বঙ্গ জুড়ে সেচবিপ্লব ঘটাতে হ'লে যে-অর্থ প্রয়োজন, তা রাজ্য সরকারের নেই, কেন্দ্রের প্রসাদের উপর নির্ভর করতে হবে এবং কেন্দ্রের প্রসাদের অনেক দাবিদার।

শিল্পের ক্ষেত্রেও একই সমস্যা। গত দশ-বারো বছরে ভারতবর্ষের অন্যত্র শিল্পোৎপাদন প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ বেড়েছে, পশ্চিম বঙ্গে অন্য পক্ষে এক-তৃতীয়াংশ

কমেছে, কর্মসংস্থানও তাই আনুপাতিক হারে হ্রাসপ্রাপ্ত। গোটা দেশের এক কোটির মতো মানুষ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম লিখিয়েছেন, তার চল্লিশ লক্ষের উপর পশ্চিম বঙ্গে। যে-শিল্পপতিব্যবসায়ীরা এক সময়ে কলকাতার বুকে ব'সে প্রচুর মুনাফা লুটেছেন, সেই মুনাফার টাকা পশ্চিম বঙ্গে ফের নিয়োগ করতে তাঁরা আর আদৌ উৎসুক নন, এখানকার ছায়া বামগামিনী। সরকারি উদ্যোগে যদি যথেষ্ট টাকা ঢালা হতো, তা হ'লে হয়তো অবস্থা অন্যরকম হতো, নতুন কল-কারখানার পত্তন হতো, বন্ধ কারখানাগুলি চালু হতো, শিল্পের চেহারা ফিরলে ব্যবসাবাণিজ্যে ও কাজকর্মের ঈষৎ সুরাহা হতো। এখানেও একই মুশকিল। রাজ্য সরকারের তহবিল ফাঁকা, শিল্পবাণিজ্যের প্রসারে সাহায্য করতে হ'লে যে-পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তা একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারই যোগাতে পারেন। কিন্তু কেন্দ্রের উপর চাপ অনেক। সারা দেশের ষাট কোটি মানুষের মাত্র সাড়ে চার কোটি পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসী, কেন্দ্রে যাঁরা অধিষ্ঠিত, তাঁদের কাছে বহুবিধ সমস্যার আপেক্ষিক মূল্যায়নও সম্ভবত অন্যরকম, তেমন বেশি তাই কেন্দ্রের কাছ থেকে এই রাজ্যে পৌছয় না। অনেক ব্যাপারে একটু কমই পৌছয়। যেমন ধরুন পশ্চিম বঙ্গ থেকে আয়কর ও অন্যান্য শুল্ক বাবদ কেন্দ্র যে-পরিমাণ রাজস্ব আহরণ করেন, তার সামান্য অংশই আমাদের এখানে ফেরত আসে। অথবা জীবনবীমা সংস্থা প্রতি বছর প্রিমিয়াম বাবদ যে-অর্থ কুড়োন, এখানে বিনিয়োগ করেন তার ভগ্নাংশ মাত্র। ব্যাঙ্কগুলি যে-পরিমাণ আমানত উপায় করেন, ধার দেন তার চেয়ে অনেক কম।

এমনটি যে হ'তেই হবে তা নয়। রাজ্যে যদি জোরদার সরকার থাকে, যে-সরকার চেঁচিয়ে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলতে পটু, তা হ'লে অবস্থা অন্যরকম হ'তে বাধ্য। এখানে নীতির কোনো প্রশ্ন নেই। পৃথিবীর ইতিহাসে অহরহ এটা হয়েছে, যে চাপ সৃষ্টি করতে পেরেছে সে-ই জয়ী। পশ্চিম বঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থা উত্তরোত্তর যেহেতু অবনতির দিকে, চেঁচিয়ে পাড়া গরম করার অধিকার আমাদের নিশ্চয়ই পুরোপুরি আছে। অথচ এমনই কপাল, বিগত পনেরো বছরে, মাত্র কয়েক মাসের কথা বাদ দিলে, রাজ্য সরকারের যাঁরা হাল ধ'রে থেকেছেন, তাঁরা বড্ডো বেশি কেন্দ্রের প্রতি বশংবদ। এ-সব ক্ষেত্রে গলবস্ত্র হয়ে ভিক্ষাপ্রার্থী হ'লে বিশেষ সুবিধা হয় না, পাঞ্জাব-হরিয়ানা-গুজরাট-মহারাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা বেশি চ্যাঁচাতে পেরেছেন, নিজেদের কোলে ঝোলও তাই তাঁরা ভালোই টেনেছেন।

কেউ-কেউ বলবেন, সমস্যাটি সংবিধানগত, কেন্দ্রের সঙ্গে বিসংবাদ নয়, যা প্রয়োজন তা সংবিধান শুধরে আর্থিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। কথাটি কটোমটো, কিন্তু মানেটা শাদামাটা। যাঁরা এই দিন-দশেক আগেও দিল্লিতে সিংহাসন আঁকড়ে ছিলেন, তাঁরা তো হাঁচতে-কাশতে সংবিধান বদলিয়েছেন, রাজ্যের আর্থিক ক্ষমতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে সংশোধনী প্রস্তাবে তা হ'লে আপত্তি হবে কেন? যে-রাজস্ব প্রতি রাজ্য থেকে সংগৃহীত হয়, তার বৃহদংশ কেন রাজ্য সরকারের ইচ্ছানুযায়ী ব্যয়িত হবে না, পশ্চিম বঙ্গের পাট-কয়লা-যন্ত্রপাতির রপ্তানি থেকে যে-বৈদেশিক মুদ্রার্জন, তা কেন এই রাজ্যের হাতের মুঠোয় আসবে না?

দিল্লি বড়ো দূর। ওই দূরত্ব থেকে এই রাজ্যের পক্ষে কোন্‌টা শুভ, কোন্‌টা শুভতর, সব সময় তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। এক কোটি টাকা দিয়ে আরেকটি সাঁজোয়া ট্যাংক কেনা উচিত, নাকি কলকাতার পরিবহন সংস্থার জন্য পঞ্চাশটি বাড়তি দোতলা বাস, দিল্লির শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে ব'সে সে-বিষয়ে যথাযথ সিদ্ধান্তে পৌঁছনো অসম্ভব, যেমন অসম্ভব নির্ণয় করা কুড়ি কোটি টাকা খরচ ক'রে দিল্লিতে আরেকখানা সরকারি হোটেল খোলা, কিংবা ওই টাকা দিয়ে বাঁকুড়া জেলায় সেচব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর মধ্যে কোন্‌টি শ্রেয়তর।

দিল্লি বড়ো দূর, কিছু-কিছু সিদ্ধান্ত, যার সঙ্গে আর্থিক উন্নতির মূল সূত্র গ্রথিত, রাজ্য সরকার স্বয়ং কেন নেবেন না? মনে হয় না কেন্দ্র-কর্তৃক সংগৃহীত রাজস্বের বড়ো অংশ রাজ্য সরকারের হাতে পৌঁছে দেওয়ার সালিশি ক'রে আমি কেন্দ্রকে দুর্বল করার পথ দেখাচ্ছি। রাজ্যগুলি সবল-সচল না হ'লে কেন্দ্রও ঠুঁটো জগন্নাথ হ'তে বাধ্য। রাজ্যে-রাজ্যে যুবকরা-তরুণরা যদি বেকার থাকে, বিনিয়োগের কৃচ্ছ্রে-সেচের অভাবে - পরিবহনব্যবস্থার দৈন্যে লোকের মনে রাগ-তিক্ততা-বিদ্বেষ দানা বাঁধে, তা হ'লে ধোপে রাজ্য-কেন্দ্র কেউই টিঁকবে না। এটাই আসল নিরাপত্তার প্রশ্ন। একটি বাড়তি সাঁজোয়া ট্যাংক কেনা না হ'লে অবস্থার খুব একটা তারতম্য ঘটবে না। কলকাতার রাস্তায় পঞ্চাশ কি একশোটি বেশি বাস বেরোলে অনেকটাই হবে।

যাদের রাজা হবার পালা

নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, রাস্তাটা এবড়োখেবড়ো, সাধারণ গাড়ি যেতে পারে না। কাঁথি শহরে কমরেডরা স্টেশন ওয়াগন-গোছের উঁচুমতো একটা গাড়ির ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন। ড্রাইভার জানালেন, যে-রাস্তা ধ'রে যাচ্ছি সেটি কাজের-বিনিময়ে-খাদ্য প্রকল্পের গমে-টাকায় তৈরি হয়েছে। একটু এবড়োখেবড়ো হ'তে পারে, কিন্তু গাঁয়ের মানুষ নিজেদের গতর খেটে তৈরি করেছে এটা, ভারি গর্বের জিনিশ এই রাস্তা। সামনের বছর, যখন পঞ্চায়েত কাজ শুরু করবে, রাস্তাটা আরো পাকাপোক্ত হবে, একেবারে গহন অভ্যন্তরে তা হ'লে এমনকি সাধারণ গাড়ি নিয়েও চ'লে যাওয়া যাবে।

নিশ্ছিদ্র, নিঝুম অন্ধকার, এবড়োখেবড়ো পথ বেয়ে এগোচ্ছি, সময় রাত এগারোটা ছুঁই-ছুঁই, জনমনিষ্যির কোনো সাড়া নেই; খটকা লাগলো, সত্যিই ঠিক জায়গায় যাচ্ছি তো, এত রাত্তির, কখন আর তা হ'লে সভা হবে, কে-ই বা আসবে সভায় কথা গিলতে?

দু-দণ্ড বাদে ভুল ভাঙলো। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সেই গানের কলির মতো, চকিতে বিজলী আলো চোখেতে লাগালো ধাঁধা। না, বিজলী আলো নয়, হঠাৎ এক উন্মুক্ত প্রান্তরে গিয়ে পৌঁছলাম, দু-তিনটে পেট্রোম্যাক্স শোভা পাচ্ছে। লাল ঝাণ্ডা, মানুষের কলরোল-উৎসাহ, স্লোগানের মুখরতা, অন্তত হাজার-চারেক মানুষ, সাধারণ মানুষ। রাত এগারোটা পেরিয়ে গেছে, পাকা রাস্তা থেকে যেখানে গিয়ে পৌঁছলাম কম ক'রে দশ মাইলের ব্যবধান, কাঁথি থেকে আমরা অন্তত পঁচিশ মাইল দূরে, ঘোর অভ্যন্তর, গহনতম পল্লী। সাধারণ মানুষের গ্রাম, খেতমজুরের গ্রাম, ছোটো চাষীদের গ্রাম, ভাগচাষীদের গ্রাম, জেলে-মালোদের গ্রাম। রাত এগারোটা বেজে গেছে, আমি ভাবতেও পারিনি এত লোক এত রাত্তিরে আমার মতো সাধারণ একজনের বক্তৃতা শোনবার জন্য এতটা উৎসাহ নিয়ে প্রতীক্ষমান থাকতে পারে গ্রাম-বাংলার এই গহনতম অন্ধকার প্রান্তরে।

রাত্রির অন্ধকার দীর্ণ ক'রে স্লোগানের উচ্ছল সংগীত। লাল ঝাণ্ডার চমক, গ্রামের মানুষ, স্ত্রী-পুরুষ-বৃদ্ধ-যুবা-শিশু। সাধারণ মানুষ, ছিন্নকন্থা মানুষ, অভুক্ত-অর্ধভুক্ত মানুষ, যে-মানুষগুলি বছরের-পর-বছর ধ'রে কিছুই পায়নি। পানীয় জল থেকে শুরু ক'রে সেচের জল, চাষের জমি থেকে শুরু ক'রে রাস্তা, সার থেকে শুরু ক'রে ঋণ, উন্নত বীজশস্য থেকে শুরু ক'রে কীটনাশক ওষুধ, লেখাপড়া শেখার সুযোগ থেকে শুরু ক'রে দু-বেলা দু-মুঠো ভাত কিংবা চিকিৎসার সামান্যতম সুযোগ। কিছুই পৌঁছয়নি এই এতগুলো বছর ধ'রে। কিছু যে পৌঁছতে পারে তা এমনকি ষোলো-সতেরো মাস আগেও ভাবা অকল্পনীয় ছিল। কিন্তু জাদু ঘ'টে গেছে, জাদু ঘ'টে গেছে বাইরের কারো অঙ্গুলি-হেলনে নয়, জাদু ঘটেছে কারণ গাঁয়ের-গঞ্জের সাধারণ মানুষগুলি তা ঘটিয়েছে। গত বছরে যে-আশ্চর্য পরিবর্তন সারা দেশ জুড়ে সূচিত হলো, তার গৌরবের-কৃতিত্বের ভাগীদার, অন্য-সকলের সঙ্গে, হয়তো অন্য-অনেকের থেকে অনেক বেশি ক'রে, পশ্চিম বাংলার গ্রামের মানুষ। এই গ্রামেরও মানুষ, কাঁথি শহর থেকে অন্তত পঁচিশ মাইল দূরে গহন অন্ধকার যে-গ্রামে জোতদার ছিল, আছে। যে-গ্রামে সুযোগ-সুবিধা-গুলি জোতদার-রাজপুরুষ-মহাজনরা নিজেদের মধ্যে এতদিন বাঁটোয়ারা ক'রে নিচ্ছিলেন। কিন্তু সেই গ্রামেও এখন জাদুর ছোঁয়া লেগেছে। মানুষগুলি ছিন্নকন্থা, অভুক্ত, নিরক্ষর, স্বাস্থ্যের সুযোগবিহীন, ভূমিহীন, অথবা বর্গাদার, যাদের যে-কোনো দিন জমি থেকে হটিয়ে দেওয়া যায়। সেই মানুষগুলি হঠাৎ স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে।

রাত এগারোটা পেরিয়ে গেছে, পেট্রোম্যাক্সের আলোয় লাল ঝাণ্ডার ঝলক, পঞ্চায়েত নির্বাচন আসন্ন, আর দু-দিন বাদেই। পঞ্চায়েত নির্বাচনে বাস্তুঘুঘুদের তাড়াতে হবে। পঞ্চায়েতগুলি দখল করতে হবে সর্বস্তরে, দখল ক'রে সাধারণ মানুষগুলি পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে ব্যবহার করবেন নিজেদের প্রয়োজনে। নিজেদের অগ্রাধিকার তাঁরা নিজেরা বিচার করবেন, যাচাই করবেন, স্থির করবেন কোন্ কাজটা আগে, কোন্ কাজটা পরে। সিদ্ধান্ত নেবেন তাঁদের আশু কী-কী প্রয়োজন, ভূমি-সংস্কারের পাশাপাশি আর কী-কী। সেচের জলের ব্যবস্থা না কি শস্যগোলা, না কি উঁচু করে আল-বাঁধা, না কি একটা রাস্তা তৈরি করা, না কি কোনো স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ব্যবস্থা করা, না কি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য দালান-কোঠা তোলা। বাইরের কেউ মাথা গলাতে পারবে না, রাজপুরুষ কি মহাজন কি জোতদার কোনো বাইরের মানুষেরই কোনো অধিকার থাকবে না আর।

গাঁয়ের মানুষ, সাধারণ মানুষ, দিনমজুর, খেতমজুর, ছোটো চাষী, ভাগচাষী, তাঁরা এবার রাজা হবেন। আর যারা প্রথাগত রাজা ছিল — জমিদার-জোতদার-মহাজন - বি. ডি. ও. সাহেব - এক্সটেনশন্ বাবু — তারা এখন থেকে প্রজা। রাজা-প্রজা সম্পর্ক এবার উল্টে যাবে। গাঁয়ের মানুষ নিজেদের অগ্রাধিকার নিজেরা বিবেচনা করবেন। বিবেচনা ক'রে তার পর তাঁরা উন্নয়ন-প্রকল্প নির্ধারণ করবেন, ক'রে কী ভাবে সে-সমস্ত প্রকল্প রূপায়িত করা যায় তা-ও তাঁরা নিজেরাই স্থির ক'রে নেবেন। হয়তো বড়ো জোর পঞ্চায়েত সমিতির তরফ থেকে কোনো ছোটো বা মাঝারি এঞ্জিনীয়ার বাবুকে পাঠানো হলো, তাঁর সহায়তা খানিকটা নেবেন। প্রকল্প স্থির ক'রে গাঁয়ের যে-সমস্ত জোয়ানবয়সী ছেলেদের-মেয়েদের কাজ জুটছে না তাঁদের সেই-সেই প্রকল্পে কাজে লাগাবেন। শস্যগোলা তৈরিই হোক, আল-বাঁধাই হোক, রাস্তা সংস্কারই হোক, কি স্কুলবাড়ি তৈরি করাই হোক, গাঁয়ের কাজ গাঁয়ের মানুষই করবে, ঠিকাদারদের আর গাঁয়ের ত্রিসীমানা মাড়াতে দেওয়া হবে না। গাঁয়ের টাকা গাঁয়ে থাকবে, সেই টাকা পঞ্চায়েত মারফত গাঁয়ের মানুষের করতলগত হবে। গত কুড়ি বছর ধ'রে প্রতি পঞ্চায়েতের হাতে বছরে খুব বেশি হ'লে দুই কি তিন হাজার টাকা আসত। টাকাগুলি অঞ্চলপ্রধান-জমিদার-জোতদারবাবুরা আত্মসাৎ ক'রে নিতেন। এখন থেকে টাকার পরিমাণ দু-তিন হাজার নয়, পঁচিশ হাজার - তিরিশ হাজার, চল্লিশ হাজার - পঞ্চাশ হাজার - ষাট হাজার, সেই সঙ্গে গম, সেই সঙ্গে অন্যান্য সরঞ্জাম উপকরণাদি।

গাঁয়ের মানুষ হঠাৎ বুঝতে পেরেছে জমানা পাল্টে যাচ্ছে, বুঝতে পেরেছে এই এতগুলি বছর পেরিয়ে তারা হঠাৎ স্বাধীনতার প্রান্তে উপনীত। স্বাধীন আকাশের তলায় এতদিন বাদে তারা নিজেরাই রাজা-উজির-মালিক। আর যারা মালিক ছিল এখন থেকে তারা গোলাম, পঞ্চায়েতের গোলাম। ওই বি. ডি. ও. - এক্সটেনশন্ বাবুর দল — গাঁয়ের সাধারণ মানুষের কথা এখন থেকে তাদের শুনতে হবে।

রাত এগারোটা পেরিয়ে গেছে। এই নিশ্ছিদ্র অন্ধকার পল্লীতে চার হাজার লোক মাটিতে ব'সে কথা শুনছে, যাচাই করছে। তাদের অক্ষরপরিচয় না থাকতে পারে, কিন্তু পৃথিবীটাকে চেনে তারা, জানে কারা তাদের আপনজন, কারা তাদের শত্রু। তারা কথাগুলি যাচাই করছে, নিজেদের মনে ঝালিয়ে নিচ্ছে। কোথাও হাততালি পড়ছে, কোথাও তারা ভাবনায় ডুবে যাচ্ছে। এই

এতগুলি স্বাধীন মানুষ, এই এতগুলি রাজা, তাদের সামনে ফিরিস্তি দিতে গিয়ে, জবাবদিহি দিতে গিয়ে, ভয়ে, সম্ভ্রমে, আবেগে আমার বুক দুরুদুরু কাঁপছে। এতগুলি স্বাধীন মানুষকে অভিবাদন-অভিনন্দন জানিয়ে আমি নিজেকে গর্বিত মনে করছি। সেই সঙ্গে বুঝতে পারছি যে আমরা ফড়েরা কেউ নই, আমাদের দিন ফুরিয়েছে। দেশের যারা আসল মানুষ, দেশের যারা আসল রাজা, তাদের সামনে আমাকে জবাবদিহি দিতে হচ্ছে। প্রতিটি পদেই আমাকে আমার কর্তব্য নির্ধারণ ক'রে নিতে হবে এই সাধারণ মানুষগুলির বিচারের কষ্টিপাথরে যাচাই ক'রে নিয়ে।

কাঁথি শহরের দিকে রাত্তিরে যখন ফিরছি, কমরেড অনুরূপ পণ্ডাকে জিজ্ঞেস করলাম: কেমন বুঝছেন? গত বছর বিধান সভা নির্বাচনে গোটা কাঁথি মহকুমার আটটি আসনের একটিও আমাদের ভাগ্যে জোটেনি, সব ক'টাই অন্য দলের কুক্ষিগত হয়েছিল। ভয়ে-ভয়ে কমরেড পণ্ডাকে প্রশ্ন করলাম: জেলা পরিষদের মোট বাইশটি আসনের ক'টা পাবেন? জবাব পেলাম: অন্তত আটটি তো আসবেই।

দু'সপ্তাহ বাদে ফল বেরলো। গোটা কাঁথি মহকুমার জেলা পরিষদের বাইশটি আসনের আঠারোটি আমাদের দখলে। গাঁয়ের সেই মানুষগুলির ভুলে ভুল হবার নয়। তারা এতদিন বাদে শিখেছে এবার তাদের রাজা হবার পালা।

একটি হতভম্ব কবুলতি

আল ভেঙে, বাঁধ ভেঙে, কাতারে-কাতারে শ্রমজীবী মানুষের ভিড়। অমিত বিশ্বাসে হাঁটছে তারা, সংঘবদ্ধ শক্তি, রাজপথ-জনপথ কাঁপছে, শ্রমজীবী মানুষ ইতিহাস রচনা করছে, বজ্রমুষ্টি আকাশের দিকে তুলে ধ'রে যেন আকাশকেই বলছে, ইতিহাসের ধারা মিথ্যে হবার নয়, আমরাই ইতিহাস গড়ছি। অথচ, এরই পাশাপাশি, বাইরে যতই ভণিতা ক'রে থাকি-না কেন, অন্য দিকে ঈষৎ হতাশ্বাস হ'তে হয়। এখন আর সোভিয়েট-চীন বিবাদ-বিসংবাদ নয়, এখন ভিয়েতনাম-কাম্পুচিয়া কে কাকে কতটা গালাগাল দিতে পারে, পারস্পরিক হানাহানিতে লিপ্ত হ'তে পারে, তা নিয়ে প্রতিযোগিতা। আমরা যারা আজ থেকে পঁয়তিরিশ-চল্লিশ বছর আগেকার সমকালীন সময়ে মার্কসবাদের তথা সমাজবিপ্লবের স্বপ্নে প্রথম বিভোর হয়েছিলাম, স্বগতোক্তি করি: 'ধরণী, দ্বিধা হও'। হালের তরুণরা কোন্ স্বপ্নের অঞ্জনে তাঁদের চোখকে আচ্ছন্ন ক'রে নেবেন? বিপ্লবোত্তর কোন্ সমাজের প্রতিভাস তাঁদের কাছে আদর্শ হিশেবে স্থিত থাকবে? মার্কসবাদের সংজ্ঞা তাঁদের কাছে কোন্ রূপ নিয়ে ধরা দেবে? সমস্ত তো এলোমেলো, ছিন্নবিচ্ছিন্ন, খণ্ড-বিখণ্ড। সুতরাং আপাতত ঘটনা-পরম্পরায় যেখানেই আমরা পৌঁছে থাকি-না কেন, ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে যেন ভয় করে। ভবিষ্যৎ তো গড়বেন তাঁরা যাঁরা বর্তমান মুহূর্তে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন, সমাজ-বিপ্লবের প্রতিজ্ঞায় নিজেদের দীক্ষিত ক'রে নিচ্ছেন। তাঁরা নিমগ্ন হবেন, কিন্তু কোন্ ধর্মে নিমগ্ন হবেন? সেই ধর্মের নিহিত সারাৎসার কী? সুতরাং অবাক হই না যখন দেখি আমরা যে-বয়সে সমাজ-চিন্তার দিকে ঝুঁকে পড়েছিলাম, সেই বয়সের ছেলেমেয়েদের একটি বিরাট অংশ অন্যত্র ব্যাপৃত, এক গভীর অনীহা তাঁদের চেতনা সমাচ্ছন্ন ক'রে আছে। তাঁরা এই প্রজ্ঞায় পৌঁছেছেন যে আদর্শনিষ্ঠা মিথ্যা, যাঁরা দেশে-দেশে খেটে-খাওয়া মানুষের সৌভ্রাত্রের কথা ঘোষণা করেন তাঁরা অনৃতভাষণ করছেন, এমন-কোনো বিজ্ঞান বা ধর্ম নেই যা সব দেশের শ্রমিকশ্রেণীকে এক আদর্শের বিন্দুতে

উপনীত করতে পারে; এবং তা-ই যদি হয়, তা হ'লে শ্রেণী-সংহতির প্রস্তাব যেমন অলীক, শ্রেণীসংঘাত, শ্রেণীদ্বন্দ্ব, শ্রেণীযুদ্ধ ইত্যাকার প্রসঙ্গও সমান প্রক্ষিপ্ত; সুতরাং, কী দরকার, এসো আমরা অন্তচারী হই, আমরা সমাজকে ভুলে গিয়ে, দরিদ্র-লাঞ্ছিতদের প্রসঙ্গ পাশে সরিয়ে রেখে, নিজেদের নিয়ে লীলা-কেলি করি, সবার উপরে ব্যক্তিস্বার্থ শ্রেষ্ঠ, তার উপরে নেই।

মানছি, আদর্শ সম্পর্কে এই শ্রদ্ধা-স্খলন এখনো পর্যন্ত মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত-শ্রেণীভুক্ত তরুণ-তরুণীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। গ্রামে-গঞ্জে-কারখানায়-মাঠে সাধারণ যে-শ্রমজীবী প্রায়-নিরক্ষর, পৃথিবী সম্বন্ধে প্রায়-অজ্ঞ, তাদের কাছে এই আদর্শ-চ্যুতির খবর এখনো পৌঁছয় নি। তাই এখনো আল ভেঙে, বাঁধ ভেঙে, কাতারে-কাতারে শ্রমজীবী মানুষ লাল ঝাণ্ডার ছায়াদায়িনী আশ্রয়ে এসে ভিড় করছে দিনের পর দিন। এই ভিড়ের আকার-প্রকৃতি ভারতবর্ষের সর্বত্র সমান নয়। পশ্চিম বাংলা, ত্রিপুরা কিংবা কেরালার উচ্ছ্বাস দেশের অন্যত্র অস্পর্শিত। কিন্তু, এটা তো মানতেই হয়, আমাদের দেশে গরিব শ্রেণীর আন্দোলনের মূল ঝোঁক এখনো আরো অনেক-অনেক বছর নির্ভর করবে মধ্যবিত্ততামণ্ডিত নেতৃত্ব তথা তৎপ্রেরণাসম্পৃক্ত পথ-প্রদর্শনের উপর, এবং আজ থেকে দশ, কি পনেরো, কি কুড়ি বছর বাদে আন্দোলনের ওজন নির্ভর করবে এই মুহূর্তে আন্দোলনের সঙ্গে কারা যুক্ত হচ্ছেন, কোন্ উজ্জ্বল আদর্শের ঘোরে নিজেদের অবগাহন ক'রে নিচ্ছেন, অনেকটাই তার উপর। এবং এখানেই শূন্যতা, এখানেই একটা মস্ত দিশেহারা ভাব।

আমরা প্রত্যেকে যার-যার নিজস্ব, এবং স্বভাবতই সীমিত, বিচারবুদ্ধির সংস্থানে দাঁড়িয়ে বলছি, আমার মতটা ঠিক, ওই অপরের মতটা অপাঙ্‌ক্তেয়, চীন ঠিক, সোভিয়েট ইউনিয়ন বেঠিক, সোভিয়েটরা ঠিক, চীনেরা বিচ্ছিন্নতাবাদী, ভিয়েতনাম নির্ভুল, সমস্ত দোষের আকর পল পট চক্র, অথবা কাম্পুচিয়ার অদম্য বাহিনী যাঁরা বনে-জঙ্গলে এখনো সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অনবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন আমাদের বিজয়মালা তাঁদের জন্য, ভিয়েত-নামীরা বরবাদ; কিন্তু এই আরক্ততা পেরিয়ে মুক্তি কোথায়? আমাদের মধ্যে ক'জন, যখন চকিত মুহূর্তে নিজেদের পর্যুদস্ত চেতনার মুখোমুখি হই, সে-চেতনাকে তর্জনী শাসিয়ে বলতে পারি, না, আমার কোনো দ্বিধা নেই, আমার বিচার পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ, স্বদেশে-বিদেশে শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনকে যাঁরা পরিচালনা করছেন তাঁরা যতই আন্দোলনকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করুন-না কেন, আমি

যে-অলিন্দবর্তী আছি সেই অলিন্দ ধ'রেই বিপ্লব আসবে, এমনকি আমাদের এই হতচ্ছাড়া দেশেও আসবেই? এমন উন্নতবিবেক দ্বিধাহীনদের সংখ্যা আঙুলে গোনা যায়, আমাদের মধ্যে অধিকাংশই, স্বীকার করবো, আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের কলহ-বিবাদে আমরা অবসন্ন, আমরা দুর্বলতর, আমাদের আন্দোলন যা হ'তে পারতো তার তুলনায় অনেকটাই নিষ্প্রভ।

না, আমি ধান ভান্‌তে শিবের গীত গাইছি না। স্টালিনের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনে তাঁর ইতিহাসগ্রাহ্য মূল্যায়ন করতে গিয়ে এই নাতিদীর্ঘ গৌরচন্দ্রিকার প্রয়োজন আছে ব'লেই আমি মনে করি। একবার চিন্তা ক'রে দেখুন আন্তর্জাতিক আন্দোলনের নিটোল সংহতি নড়বড়ে হ'তে শুরু করল কোন্ তারিখ থেকে? কোন্ তারিখ থেকে হঠাৎ আমরা নিরালম্ব-বায়ুভূত মানসিকতার শিকার হতে শুরু করলাম? সর্বনাশের সূচনা, মানতেই হয়, সোভিয়েট পার্টির সেই বিংশতিতম সম্মেলন থেকে। ১৯৫৬ সালে যদি নিকিতা ক্রুশ্চফ স্টালিন-নিধনযজ্ঞের উদ্বোধন না করতেন, তা হ'লে দেশে-দেশে খেটে-খাওয়া মানুষের আন্দোলন আজ এই ছিন্নভিন্নরূপ পেত না; যদি সেই সর্বনাশ না-ঘটতো, কে জানে, হয়তো গোটা পৃথিবীর জনসংখ্যার অন্তত তিন-চতুর্থাংশ ইতিমধ্যে সমাজতন্ত্রের স্নিগ্ধ-প্রসন্ন মণ্ডলের সমীপবর্তী হতো। যা হতে পারতো তা হ'তে দেওয়া হলো না। ক্রুশ্চফ সবাইকে উদ্ধত সাহস জোগালেন। যে-ধার্মিক নিয়মে-নিগড়ে শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন গোটা পৃথিবীতে বেড়ে উঠছিল, সেই নিয়মশৃঙ্খলা ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হলো। কমিউনিস্ট আন্দোলনে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা প্রথমতম শর্ত। যাঁরা নিজেদের ধর্মসহচর হিশেবে মানেন, তাঁরা পরস্পরের মতামতকে শ্রদ্ধা করেন, পরস্পরের মধ্যে আদানপ্রদান বাঞ্ছনীয় এটা মেনে নেন; সর্বস্তরে বিতর্ককে সম্মান দেন। কিন্তু এই বিতর্ক সমধর্মীদের আভ্যন্তরীণ বিতর্ক। বিতর্কের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আন্দোলনকে শাণিততর করা। সুতরাং কোনো-এক বিন্দুতে পৌঁছবার পর গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার তর্কে বিচারে উপসংহার টানতে হয়, এবং যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল তা লৌহকঠিন শৃঙ্খলার ভিত্তিতে সবাইকে মেনে চলতে হয়।

ক্রুশ্চফ সেই শৃঙ্খলা ভেঙে তছনছ করে দিলেন, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে গোটা পৃথিবী জুড়ে অরাজকতাকে আমন্ত্রণ ক'রে আনলেন। যা ছিল শ্রেণী-সংগ্রামে যূথবদ্ধ মানুষের ঘরোয়া বিতর্ক, তা শ্রেণীশত্রুদের সামনে প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে হাজির করা হলো। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা উপেক্ষিত হবার পালা শুরু

সেই প্রহর থেকে। যদিও বলা হলো ইতিহাসকে নতুন ক'রে মূল্যায়নের অধিকার যে-কোনো কমিউনিস্ট পার্টিরই আছে, সোভিয়েট পার্টি যে-অনাচারের উদ্বোধন করলেন তা ঠিক নবমূল্যায়নের পর্যায়ে পড়ে না, বরঞ্চ তা ইতিহাসকে অস্বীকার করার সামিল হয়ে দাঁড়ায়। স্থিরীকৃত, রূপায়িত, বহুপূর্বঘোষিত সিদ্ধান্ত থেকে অন্যচারিতা যেহেতু ধর্মীয় স্বীকৃতি লাভ করলো, বাঁধন টুটলো, বিচ্যুতি উথাল-পাথাল ঢেউয়ে সর্বব্যাপ্ত হলো। বিশেষ-এক দেশের বিশেষ-এক দলের বিভিন্নমুখী প্রবণতা বিচারগ্রাহ্য, তা ইতিহাসের ধারাকে যতই অসম্মান করুক-না কেন, তা আন্দোলনের যত ক্ষতিই করুক-না কেন, এই সূত্র যখন নানা দেশে ছড়িয়ে পড়লো, আগল ভাঙলো তখন, দুন্দুভিতে ঘোষিত হলো : আমরা সবাই রাজা আমাদের এই নৈরাজ্যে। আমরা এখন যাকে জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতি ব'লে অভিহিত করছি, যে-দায়ে এখন অভিযুক্ত করা চলে পৃথিবীর প্রায় সব-ক'টি সমাজতান্ত্রিক দেশ এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে, তার উৎস ওই একই সূত্র থেকে।

সুতরাং নিয়তি কেন বাধ্যতে, এই বিলাপবাণী আওড়াবার আপাতত আর তেমন-কোনো মানে হয় না। ১৯৫৬ সালের বিংশতিতম সোভিয়েট পার্টি কংগ্রেস ইতিহাসের কষ্টিপাথরে অন্তর্ঘাতমূলক অপরাধের জন্য শাস্তিযোগ্য, এটা আমার বিবেচনা। আমাদের মধ্যে অনেকের উপস্থিত যে-বিভ্রান্তঅবসন্ন চেহারা, তার জন্য পুরোপুরি দায়ী সেই কংগ্রেস, স্টালিনকে অবমাননা ক'রে যে-কংগ্রেস পিতৃহন্তার অপরাধে অপরাধী।

কেন এ-কথা বলছি? দোষে-গুণে মিলিয়ে মানুষ, নেতা, নেতার বিচারবুদ্ধি-সিদ্ধান্ত। ১৯২৪-২৫ সাল থেকে শুরু ক'রে স্টালিনের মৃত্যুর সময় পর্যন্ত গোটা আঠাশ-উনতিরিশ বছরে তাঁর নেতৃত্বাধীনে সোভিয়েট পার্টি আদৌ ভুল করেনি তা কোনো অর্বাচীনই বলবে না। ভুলের অন্য নাম অভিজ্ঞতাসঞ্চয়। অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত কিছু-কিছু প্রবণতা থেকেও সামাজিক সিদ্ধান্তে ভুল ঘ'টে থাকে। কিন্তু ওই একই সোভিয়েট পার্টি, প্রাথমিক পর্যায়ে ক্রুশ্চফের, পরে অন্যান্য নেতৃবৃন্দের, অঙ্গুলিহেলনে সেই ১৯৫৬ সাল থেকে যে-প্রবহমানতায় গা ভাসিয়ে দিয়েছে, তা ঠিক স্টালিনের একটি-দুটি ভুলের জন্য দুঃখস্বীকারের সমতুল্য নয়। বিগত দুই দশকের সোভিয়েট নেতৃত্ব স্টালিনকে অগ্রাহ্য করার নামে একটি বিশেষ ইতিহাস-মালাকেই অগ্রাহ্য করতে চাইছেন। এটা শুধু অশোভনই নয়, অবৈজ্ঞানিক।

দুটো জিনিশ আলাদা করে বলা দরকার মনে করি। সোভিয়েট দেশ যে প্রায়-একা নাৎসী জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে, হাজার ক্ষয়ক্ষত সত্ত্বেও, বিজয়ী বীর, মাথা

উঁচু ক'রে বেরিয়ে আসতে পারলো, তার কারণ তার আগের দেড় দশক ধ'রে যে-অর্থব্যবস্থা স্টালিন সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত করতে পেরেছিলেন। চাষাভুষো নিরক্ষর মানুষে-ছাওয়া একটা দেশ, শিল্পের প্রসার যৎসামান্য। সামন্ততান্ত্রিক অধ্যায়ের শেষ মুহূর্তে যা হয়ে থাকে, সারা রাজ্য জুড়ে ভূস্বামী তথা উঠতি বড়ো চাষীর প্রাধান্য। স্টালিন গোটা সমাজকে শৃঙ্খলার মন্ত্র শেখালেন, কৃচ্ছ্রসাধনায় দীক্ষা দিলেন। বিনিয়োগ বাদ দিয়ে শিল্পব্যবস্থার দ্রুত সম্প্রসারণ অসম্ভব, শিল্পসম্প্রসারণ ছাড়া বহিঃশত্রুর তথা বহিরাগতদের প্রসাদপুষ্ট শ্রেণীশত্রুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে টিঁকে থাকা অসম্ভব। সুতরাং, যে ক'রেই হোক, বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। বিনিয়োগ বাড়াতে গেলে কৃষিক্ষেত্রে ধনী কৃষককুলের উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে, এ-ব্যাপারে অকরুণ হতে হবে, কারণ করুণা মানেই বিনিয়োগে শ্লথতা, করুণা মানেই কাঁচামালের যোগানে ঘাটতি, কারখানায় শ্রমলিপ্ত মজুরের খাদ্যের যোগানেও ঘাটতি।

ঠিক এই জায়গায় স্টালিন অর্থনীতিতে একটি মহৎ নতুন সূত্র প্রবর্তন করলেন, যা এখন আমাদের বিচারে অত্যন্ত স্বতঃসিদ্ধ মনে হয়, কিন্তু আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে যার নিহিত সত্য যাচাই করতে গিয়ে অনেক টানাপোড়েন ঘটেছিল। বিনিয়োগ বাড়াতে হ'লে, ভারি শিল্পের প্রসার ঘটাতে গেলে, কোনো অনুন্নত দেশের পক্ষে হয়তো প্রথম অবস্থায় বিদেশ থেকে কিছু পুঁজি আমদানি করলে ভালো হয়, এবং সেই পুঁজির পাশাপাশি কিছু যন্ত্রপাতি। কিন্তু শ্রেণী-শত্রুরা ঘিরে রয়েছে আমাদের দেশ। মাত্র কয়েক বছর আগে তারা কোলচাক-ডেনিকিনদের নায়কতায় প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানের চেষ্টা করেছে আমাদের দেশে। তা ছাড়া, বিপ্লব সংশয়াতীত হবার পরমুহূর্তেই আমরা বিদেশী পুঁজি সমস্ত বাজেয়াপ্ত করেছি। সারা পৃথিবীতে আমরা একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশ, যে-দেশের সর্বদা সর্বনাশ চিন্তা করছে সমস্ত বড়োলোক ধনতান্ত্রিক দেশগুলির শাসনকর্তারা। সুতরাং বিনিয়োগ বাড়াতে গেলে, শিল্পের দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটাতে হ'লে, আমরা বাইরে থেকে না পাবো মূলধন, না পাবো যন্ত্রপাতি। যতটুকু যন্ত্রপাতি পাবো তা নগদ টাকা দিয়ে আমাদের কিনতে হবে। এই অবস্থায় স্বাবলম্বী হওয়া ছাড়া অন্য উপায় নেই, প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রেও স্বাবলম্বী হওয়া প্রয়োজন। এবং স্রেফ স্বাবলম্বনের উপর নির্ভর ক'রে বিনিয়োগের পরিমাণ যদি দ্রুততম করতে হয়, তা হ'লে দরকার এমন ব্যবস্থার যা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়কে বাড়াতে পারে।

স্টালিন সারা পৃথিবীকে একটি নতুন প্রকরণ শেখালেন। আমরা একা, অন্য কেউ আমাদের কিছু দিচ্ছে না, এই পরিস্থিতির মধ্যেও আমাদের এগিয়ে যেতে হবে, এগিয়ে যেতে হ'লে সঞ্চয় বাড়াতে হবে। সঞ্চয় না বাড়ালে বিনিয়োগ বাড়বে না, বিনিয়োগ না বাড়লে আর্থিক বিকাশের গতি ক্ষিপ্রতর হবে না, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায়ও ভাঁটা পড়বে। কিন্তু আছে, উপায় আছে, বিনিয়োগের প্রতি পর্যায়ে, প্রতি বৎসর প্রতি মুহূর্তে, বিনিয়োগের বিন্যাস এমন করা হোক যাতে আনুপাতিকভাবে যন্ত্রপাতিকলকব্জা তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি-কলকব্জার উৎপাদন বাড়ে, এবং পাশাপাশি ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির উৎপাদন আনুপাতিক হারে কমে। ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কলকব্জার উৎপাদন তুলনামূলকভাবে হ্রাস পেলে সামগ্রিক জাতীয় উৎপাদনে ভোগ্যপণ্যের উৎপাদনের আনুপাতিক পরিমাণও কমবে। সাধারণ মানুষ ভয়ংকর অভাবের জ্বালা সত্ত্বেও কলকব্জা ভক্ষণ করতে পারবে না, যন্ত্রপাতি পরিধান করতে পারবে না; অতএব সঞ্চয় বাড়বে, অতএব বিনিয়োগ বাড়বে, অতএব আর্থিক প্রগতি ব্যাপকতর-তীব্রতর হবে, প্রতিরক্ষার সরঞ্জাম বাড়বে, দেশটা শক্তিশালী হবে, সমাজতান্ত্রিক দেশ, পৃথিবীর একমাত্র সমাজ-তান্ত্রিক দেশ, বাকি পৃথিবীর রাজপুরুষদের সম্মিলিত ষড়যন্ত্র পরোয়া না ক'রে বিজয়কেতন শূন্যে ওড়াতে সক্ষম হবে।

নির্দয় পদ্ধতি, মায়াহীন প্রকরণ। কিন্তু শ্রেণীহীন সমাজের স্বপ্ন যাঁরা দেখেন, সে-সমাজকে যাঁরা একটি মজবুত ভিতের সংস্থানে দাঁড় করাতে চান, মায়াহীনতা তাঁদের ভূষণ না হ'লে কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশই এগোতে পারতো না। স্টালিনের আর্থিক প্রকরণ বাদ দিয়ে যুদ্ধকালীন বা যুদ্ধোত্তর সোভিয়েট ইউনিয়নের সত্তাস্থিতি অকল্পনীয়। সোভিয়েট ইউনিয়নের অবস্থান বাদ দিয়ে পূর্ব ইওরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিকাশও সমান অকল্পনীয় ছিল। এবং, বর্তমানের এলোমেলো মুহূর্তে কথাটা হয়তো অনেকে প্রত্যক্ষভাবে স্বীকার করতে চাইবেন না, কিন্তু ১৯৪৭-৫০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে চীন দেশে মুক্তি-ফৌজের অপ্রতিরোধ্য বিজয়যাত্রা, সোভিয়েট ইউনিয়নের তাৎক্ষণিক সাহায্য যদি হাতের নাগালে না থাকতো, এখানে-ওখানে, সামান্য কিছু সময়ের জন্য হ'লেও, শ্লথগতি হতো অবশ্যই। তা হ'লে ইতিহাসের গত তিন দশকের ধারাও একটু অন্য রকম নিশ্চয়ই হতো, এবং তা-ই যদি হতো, তা হ'লে কিউবা-ভিয়েতনাম-কম্বোজ কাহিনীও ভিন্নতর খাতে হয়তো বইতো।

একটু আগে যা বলছিলাম, সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতারা ১৯৫৬ সাল থেকে যে-ভূমিকায় নিজেদের স্থিত রেখেছেন, তা অবৈজ্ঞানিক, অগাণিতিক। যে-দুঃখের ঋতু অতিক্রম না ক'রে সহকারশাখাটি পুষ্পিত-পল্লবিত হ'তে পারে না, তাঁরা বলছেন সেই দুঃখের ঋতুটির কোনো প্রয়োজন ছিল না, পুষ্পপল্লবপুঞ্জ অথচ তাঁরা মহাসমারোহে ভোগ ক'রে যাচ্ছেন। সোভিয়েট দেশে আজ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-সমৃদ্ধির উপচে-পড়া পরিবেশ। এই সমৃদ্ধির জন্য, কৃতজ্ঞতাপ্লুত ধর্মীয় কর্তব্য ছিল অহরহ পিতৃপুরুষকে তর্পণ করা। সোভিয়েট নেতারা বিপ্রতীপ সিদ্ধান্তে পৌছেছেন; তাঁরা যুগপৎ জাতি-অস্মর ও কৃতঘ্ন, এমনকি বলা চলে পিতৃঘ্ন।

দ্বিতীয় যে-প্রসঙ্গ বর্তমান বছরে, বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে, উল্লেখ করতে হয় তা স্টালিনের প্রজাতিতত্ত্ব ও তদ্‌ফলিত নীতি। অসমান সামাজিক বিকাশ, বিচিত্র ভাষাভাষী, আর্থিক ব্যবস্থায় উচ্চাবচতা, ভৌগোলিক দূরত্ব; সেই সুদূর ১৯২০ সালে এটা দুরূহ কল্পনা ছিল যে সব-কিছু মেলানো যাবে, সমস্ত পাটীগণিত সরলীকৃত হয়ে আসবে, সমস্ত প্রজাতি নিজেদের সত্তার সংস্থানে বিকশিত হ'তে পারবে, তাদের সংস্কৃতি শুধু অটুট থাকবে না, আরো বহু-বিচিত্র ঐশ্বর্যের সম্ভারে বিকশিততর হয়ে উঠবে। যা ভাবা কঠিন ছিল আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে, তা আজ স্বতঃসিদ্ধ বাস্তবে রূপায়িত। এটাও স্টালিনের অখণ্ড উত্তরাধিকার, কিন্তু এই হট্টগোলের মধ্যে ক'জনই বা তা আর মনে রাখছেন।

দোষেগুণে মিলে মানুষ, দোষেগুণে মিলে আমাদের পিতৃপুরুষরাও, যাঁদের আমরা আত্মজ; কিন্তু এখন দোষগুলির ঢালাও কীর্তন ক'রে ঋতুর-পর ঋতু-জুড়ে তত্ত্ব দাঁড় করানো হচ্ছে, মহত্তর কীর্তির কথাগুলি শাক দিয়ে ঢেকে রাখার চেষ্টা চলছে। এই প্রয়াসের চেয়ে আত্মঘাতী কিছু হ'তে পারে না। আত্মহনন-লিপ্সার মাশুল গুনছি আমরা এখন।

আল ভেঙে, বাঁধ ভেঙে কাতারে-কাতারে শ্রমজীবী মানুষের ভিড়। জনপথ-রাজপথ কাঁপছে। এই খেটে-খাওয়া মানুষগুলি নতুন ইতিহাস রচনা করছে, করবে। কিন্তু আপাতত তারা একা, নিজের-নিজের দেশের সংস্থানে আবদ্ধ, কারণ শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সৌভ্রাত্র-কাহিনী আপাতত প্রক্ষিপ্ত, স্টালিন-নিধন-যজ্ঞের মাশুল গুনছি আমরা।

অভিনয়? অভিনয় নয়?

একটি কিংবদন্তী দিয়ে শুরু করা যাক। জীবনভর কবি বায়রন নিজের স্ত্রীকে প্রচুর জ্বালিয়ে গিয়েছিলেন। গ্রীক স্বাধীনতার যুদ্ধে বায়রনের মৃত্যুসংবাদ যখন মহিলার কাছে পৌঁছল, জনশ্রুতি, তিনি স্বগতোক্তি করেছিলেন: 'I really cannot determine whether he was or was not an actor.'

বিশ্ব ব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক আলাপ-আচরণ সম্পর্কেও ঠিক ওই ধরনের কোনো মন্তব্য প্রয়োগ করতে মাঝে-মাঝে ইচ্ছা হয়। সারা পৃথিবীর, বিশেষত অনুন্নত দেশগুলির, দরিদ্রতম শ্রেণীর জন্য হঠাৎ বিশ্ব ব্যাঙ্কের দরদ উথলে উঠেছে। ব্যাঙ্কের যেন আর দেরি সইছে না। দিস্তায়-দিস্তায় দলিল-দস্তাবেজ তৈরি হচ্ছে, সভা-সম্মেলন-সেমিনার ডাকা হচ্ছে, ঝুড়ি-ঝুড়ি উপদেশ-উপরোধের বন্যা বইছে: আমরা, বিশ্ব ব্যাঙ্কের হোমরা-চোমরা চেলা-চামুণ্ডারা, কাকুতি-মিনতি করছি, তোমরা অবধান করো, হে ধনী রাষ্ট্রসমূহ, তোমরা তোমাদের প্রভূত সম্পদের ঈষদংশ আমাদের মধ্যবর্তিতায় অনুন্নত রাষ্ট্রগুলিকে সুলভ হারে লগ্নি করো, ওরা সেই সম্পদের সাহায্যে ওদের দেশের গরিবদের অবস্থার মোড় ফেরাবার প্রয়াসে প্রয়োগ করুক; হে দরিদ্র রাষ্ট্রসমূহের সরকারবাহাদুরবৃন্দ, তোমাদের আমরা টাকাপয়সা সংগ্রহ ক'রে দিচ্ছি, কিন্তু সত্বর তোমরা টাকাপয়সার সদ্ব্যবহার শেখো, তোমাদের বুভুক্ষু দেশবাসীদের দুঃখ-দুর্দশায় আমরা গ'লে নদী হচ্ছি, এই দুঃখ-দুর্দশা দূর করার উদ্দেশ্যে আমরা অন্যত্র থেকে তোমাদের পয়সাকড়ি জুটিয়ে দিচ্ছি, দোহাই, হেলায়-ছড়ায় নষ্ট কোরো না সে-সব। তোমাদের ধনী-

* *Redistribution with Growth.* By Hollis Chenery, Montek S. Ahluwalia, C. L. G. Bell, John H. Duloy, Richard Jolly. A joint study by the World Bank's Development Research Centre and the Institute of Development Studies at the University of Sussex. Oxford University Press, 1974. £ 1. 40 p.

সম্প্রদায় নিজেদের আখের তো যথেষ্ট গুছিয়েছেন, বিগত তিরিশ বছর দেশে-দেশে অর্থনৈতিক অসাম্য তো গভীরতর থেকে গভীরতম হয়েছে, কিন্তু আর কেন, এবার তাঁরা একটু মানবিকতার চর্চা করুন, গরিবদের কী ক'রে ভালো করা যায় সেই চিন্তায় নিজেদের নিয়োজিত করুন, এই আমরা, বিশ্ব ব্যাঙ্কের কর্ণধাররা, যেমন করছি, ওম্ শান্তি শান্তি, নিয়ন্দিত মধুর মতো পৃথিবীতে শান্তি বিচ্ছুরিত হোক।

অভিনয়? অভিনয় নয়? পুঞ্জীভূত পাপক্ষালনের প্রচেষ্টা? অপরাধজর্জর বিবেকের আবেগনিষ্কাশন? কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন বিশ্ব ব্যাঙ্কের রথী-মহারথীদের বর্তমান বিনম্র ভাষণকে? এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমাদের কি মনোবিজ্ঞানের দ্বারস্থ হ'তে হবে? না কি ধনবিজ্ঞানের সূত্রেই এই ধাঁধার নিরসন সম্ভব?

কারণ, হাজার কথা যদি ইতিমধ্যে বলা হয়ে যায়, তা হ'লেও, ইতিহাসকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা অসম্ভব। আজ এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকায় দরিদ্রতর শ্রেণীর দুঃখ-দুর্দশার যদি পরিসীমা নেই, বণ্টন-ব্যবস্থার অসাম্য যদি তুঙ্গে, সামাজিক অনাচার যদি কোথাও-কোথাও মধ্যযুগীয় পরিবেশকে মনে করিয়ে দেয়, সে-সমস্ত কিছুর অনেকটা দায়িত্ব তো প্রতিষ্ঠান হিশেবে বিশ্ব ব্যাঙ্কের উপরই বর্তাবে। ১৯৪৫ সালে স্থাপনার সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত এই তিরিশ বছর বিশ্ব ব্যাঙ্কের ক্রিয়া-কলাপের উপর তার প্রধান অংশীদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব অব্যাহত থেকেছে। বিশেষ ক'রে এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম কুড়ি বছর ব্যাঙ্কের কর্তারা মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের অঙ্গুলিহেলনে উঠেছেন-বসেছেন: কোন্ দেশ ভালো কোন্ দেশ মন্দ, কোন্ রাষ্ট্রপতিকে ব্যাঙ্ক কর্তৃক আর একশো মিলিয়ন ডলার ধার দিলে ভালো হয়, কোন্ দেশের নায়করা মার্কিনদের যথেষ্ট কুর্নিশ করছেন অতএব তাঁদের যেন ব্যাঙ্ক থেকে কলা দেখানো হয়, কোন্ দেশকে ঋণ দিলেও সেই ঋণের শর্তগুলি কঠিন হবে না সোজা হবে, এবংবিধ সর্বপ্রকার সিদ্ধান্তই নির্ভর করতো মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের নির্দেশের উপর। পৃথিবী জুড়ে যেখানে যত সামাজিক দুর্যোধন-দুঃশাসন, কী এক অমোঘ নিয়মবলে তাঁরা সবাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণধারদের কর্তৃক সর্ব ঋতুতে নিজেদের পরম মিত্র ব'লে পরিগণিত হতো: যারা যত বেশি অর্থনৈতিক অনাচারে পারদর্শী, যত বেশি জনসাধারণকে শোষণ করতে পটু, জাতীয় সম্পদ যত বেশি ব্যক্তিগত স্বার্থে নিয়োগ করতে সিদ্ধহস্ত, তারা তত বেশি মার্কিনসখা, তত

বেশি বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রসাদের দাবিদার। বছরের-পর-বছর ধ'রে এই-সব খল নায়করা বিভিন্ন দরিদ্র দেশের সর্বনাশ ঘটিয়েছেন। অর্থনীতি নয়-ছয় করেছেন, প্রজা-পীড়নে তন্নিষ্ঠ থেকেছেন, কিন্তু বিশ্ব ব্যাঙ্কের বিবেকে কখনো চিড় ধরে নি। বরঞ্চ টাকার পাহাড়ে সমাসীন থেকে ব্যাঙ্কের নৈয়ায়িকরা পৃথিবীসুদ্ধ লোককে তত্ত্বকথা শুনিয়েছেন: সরকারি উদ্যোগে মানবিক অনিষ্ট সাধিত নয়, ব্যক্তি-কেন্দ্রিক উদ্যোগ অন্য পক্ষে সকল শুভের আকর, অতএব, হে বালকবৃন্দ, তোমরা যদি ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পেতে চাও, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ পরিহার করো, শিল্পপতি-ভূস্বামীদের হাতে তোমাদের জাতীয় ভবিষ্যৎ সমর্পণ করো, আমরা তা হ'লে টাকার বন্যায় তোমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যাবো; তা ছাড়া, বৎসগণ, এটাও ভেবে ছাখো, বণ্টনের সমস্যা কোনো সমস্যাই নয়, উৎপাদনের সমস্যাই আসল, শিল্প-পতি-ভূস্বামীরা যদি একবার উৎপাদন বাড়িয়ে দিতে পারেন, বণ্টনের ব্যাপারটা তা হ'লে ধীরেসুস্থে মিটিয়ে দেওয়া যাবে; অতএব, তোমাদের নিজ-নিজ দেশের বড়োলোকদের আপাতত তোমরা জ্বালিয়ো না, তাঁদের আখের গুছোতে দাও, তাঁরা যাতে আখের গুছোতে পারে তার জন্য তো আমরা, বিশ্ব ব্যাঙ্কের হোমরাচোমরারা, আছি।

বিশ্ব ব্যাঙ্ক এই বিশ্বদর্শনের উপর ভর ক'রে অনেক বছর অতিবাহন করেছে, এই দর্শনের ফলিতপ্রয়োগে সারা পৃথিবীতে অন্যায়ের বহর বেড়েছে, দেশে-দেশে হতভাগ্যের দল হতভাগ্যতর হয়েছে; কিন্তু যেহেতু ইতিহাস অন্য কথা বলে, যেহেতু অন্যায়-অত্যাচার-অবিচার-অসাম্যের পরিপ্রান্তে সাধারণ মানুষের রুখে-ওঠা বিদ্রোহ-বিপ্লব, বিশ্ব ব্যাঙ্কের তাই আজ নিশিতে-পাওয়া অবস্থা। হিশেবে আর মিলছে না, কোথায় যেন বিশ্লেষণে গোলমাল দেখা দিয়েছে, মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের পৃথিবীশাসনের ঋতু নিঃশেষিত-অবসিত। এখন তা হ'লে বিশ্ব ব্যাঙ্ক কী করবে, কোন্ নতুন ধ্রুবতারার দিকে মুখ ফেরাবে? তার তিরিশ বছরের জীবনে ব্যাঙ্ক এত বড়ো সংকটের আর মুখোমুখি হয়নি।

কিন্তু এই সঙ্গে একটি ব্যক্তিগত সংকটের কথা না-বললে কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ১৯৬৮ সাল থেকে বিশ্ব ব্যাঙ্কের সভাপতিরূপে বিরাজ করছেন স্বনামধন্য রবার্ট ম্যাকনামারা, ভিয়েতনামের কলঙ্কের সঙ্গে যাঁর নাম চিরকালের জন্য যুক্ত থাকবে। ম্যাকনামারা ক্ষুরধারবুদ্ধি মানুষ, জন কেনেডি তাঁকে মার্কিন 'প্রতিরক্ষা' মন্ত্রী পদে বসিয়েছিলেন, লিণ্ডন জনসনের রাজ্য শাসনের বেশির ভাগ সময়েও এই পদেই বহাল ছিলেন তিনি। 'প্রতিরক্ষা' শব্দটি তো আসলে

চতুরালি, ম্যাকনামারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আজ পর্যন্ত দক্ষতম 'বিদেশাক্রমণ' মন্ত্রী। প্রাচুর্যের অহমিকায় কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান লোপ পায়, পৃথিবীর সাধারণ পরিভাষার অভিধান পুরোপুরি উল্টে-পাল্টে যায়। ম্যাকনামারা মার্কিন বিচারে দক্ষতম 'প্রতিরক্ষা' মন্ত্রী, কারণ সবচেয়ে কম খরচে কত বেশি নিরীহ বিদেশী প্রাণ সংহার করা যায়, কত ভিন্‌দেশী খেত-খামার-কুটির-কারখানা-পোত-সড়ক-সেতু জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে-উড়িয়ে দেওয়া যায়, তাঁর তত্ত্বাবধানে সেই মার্কিন পরীক্ষা শীর্ষে পৌঁছেছিল। শক্তির দম্ভ, অর্থের দম্ভ, সারা পৃথিবী আমাদের পায়ে প্রণিপাত হোক; যদি তা না হয়, যদি কেউ তাদের আলাদা সত্তা নিয়ে, নম্রতায়, শিষ্টতায়, সাধুতায়, সভ্যতায় স্থিত থাকতে চায়, যেমন ভিয়েতনামের নচ্ছার অধিবাসীরা, তা হ'লে প্রলয়, তা হ'লে মার্কিন সহ্যশক্তির শেষ, মার্কিন প্রতিরক্ষাশক্তি তা হ'লে ঝাঁপিয়ে পড়বে, আগুন জ্বালাবে, হাজার-হাজার নারী-শিশু-পুরুষকে নির্মমভাবে হত্যা করবে, ভেঙে-চুরে সব তছনছ ক'রে দেবে; জীবনদর্শন, মার্কিন মহান্ জীবনদর্শন। এই জীবনদর্শনকে সিদ্ধপ্রয়োগে সাত বছরের বেশি সময় ধ'রে ব্যস্ত ছিলেন ক্ষুরধারবুদ্ধি রবার্ট ম্যাকনামারা: মার্কিন ক্রূরতার প্রতিভূ, মার্কিন দাম্ভিকতার প্রতিভূ, মার্কিনদের মানবিকতাস্খলনের প্রতিভূ।

অথচ, তাঁর ক্ষুরধারবুদ্ধি সত্ত্বেও, ম্যাকনামারাকেও প্রতিহত হ'তে হয়েছে, পরাজিত নায়ক তিনি। ভিয়েতনামের সাধারণ লোকেরা — শিশু-নারী-পুরুষ — মার্কিন রাষ্ট্রশক্তিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে ইতিহাসের লিখন মিথ্যে হবার নয়, মানুষের পরাজয় নয়, পৃথিবীতে ক্রূরতাই শেষ কথা নয়, সাধারণ মানুষের দুর্বার প্রতিজ্ঞার কাছে, অপরিমেয় সততা তথা সাহসের কাছে, দানবশক্তি প্রতিবারই পরাস্ত হয়। হাজার চেষ্টা ক'রেও ভিয়েতনামে জিততে পারেননি রবার্ট ম্যাকনামারা। বিক্ষত, পর্যুদস্ত, হতভম্ব, তিনি আশ্রয় নিয়েছেন বিশ্ব ব্যাঙ্কের কোলে।

অভিনয়? অভিনয় নয়? তাঁর বিবাগী মানস নতুন আবেগে সিক্ত-স্নিগ্ধ হ'তে চাইছে? ম্যাকনামারা তাঁর পুঞ্জীভূত অপরাধের অবগাহন খুঁজছেন? সব দেখে-শুনে তিনি বুঝতে পেরেছেন হত্যা নয়, এখন থেকে সৃষ্টির গহনে আত্মার মোক্ষলাভ খুঁজতে হবে? ভিয়েতনামের পাপ পৃথিবী-জোড়া গরিবদের হিতসাধনের মধ্য দিয়ে ঘোচাতে হবে? এখন থেকে তাই তাঁর সাধনা, বিশ্ব ব্যাঙ্কের সাধনা, অনুন্নত দেশগুলির দরিদ্রতর সম্প্রদায়াদির দুঃখ-দুর্দশা অভাব-

অনটন-তৃষ্ণা-বুভুক্ষা মোচনের সমস্যাদি কেন্দ্র ক'রে? রাধার কি হইল আজি অন্তরে ব্যথা?

যে-গ্রন্থ এই আলোচনার উপলক্ষ, তা স্পষ্টতই রবার্ট ম্যাকনামারা-র, এবং বিশ্ব ব্যাঙ্কের, চিন্তার-ইচ্ছার নবধারা প্রসূত। বিশ্ব ব্যাঙ্কের চেতনার ডালপালা হঠাৎ উতলা হয়েছে, ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ হঠাৎ আবিষ্কার করেছেন দেশে-দেশে, আফ্রিকায়, এশিয়ায়, লাতিন আমেরিকায়, যতটুকু আর্থিক অগ্রগতি বিগত এক দশক-দুই দশক ধ'রে হয়েছে, তার অধিকাংশই সমাজের উচ্চবর্ণদের কুক্ষিগত হয়েছে, সমাজের নিম্নবর্তী অর্ধেক – কিংবা কোনো-কোনো ক্ষেত্রে দুই-তৃতীয়াংশ – অধিবাসীর অবস্থার আদৌ উন্নতি হয়নি, প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ধনবণ্টনের অনাচার বেড়েছে, শিক্ষার-স্বাস্থ্যের-খাদ্যের-পুষ্টির বিস্ফারিত অসাম্য এক রুদ্ধশ্বাস অবস্থার সৃষ্টি করেছে। কেন এই অবস্থা সৃষ্টি হলো, বিশ্ব ব্যাঙ্ক এই পরিস্থিতির জন্য স্বয়ং কতটা দায়ী, ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ সে-প্রসঙ্গে অবশ্য নীরব থাকছেন।

সে যা-ই হোক, ম্যাকনামারা তথা ব্যাঙ্ক কোমর বেঁধে এবার নেমেছেন, গরিবদের জন্য এবার মস্ত-কিছু করতেই হবে। নীতিকথার রূপ বদলেছে, আগে উৎপাদন পরে বণ্টন এই তত্ত্বের আপাতত ঋতু শেষ, এখন নতুন সুরে বীণাখানি বাঁধা হয়েছে: উৎপাদন ও বণ্টন একসঙ্গে সম্পন্ন করা সম্ভব, প্রত্যেক দেশেই সম্ভব, বিশ্ব ব্যাঙ্কের কানে খবর পৌঁছেছে কোনো-কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশে নাকি সে-জাদু সম্ভব হয়েছে। এখন থেকে তাই বিশ্ব ব্যাঙ্ক এই মহতী কাজে নিজেকে নিয়োগ করবে। এ-ব্যাপারে বিশদ করে কী-কী করণীয় তার ফিরিস্তি দেওয়া আছে আলোচ্য বইয়ে। টাকা ঢাললে পণ্ডিতপ্রবরের অভাব হয় না, এবং বিশ্ব ব্যাঙ্কের টাকার অভাব নেই। ব্যাঙ্কের নিজের কিছু-কিছু কর্মচারী, এবং বাইরের থেকে জড়ো-করা কিছু ভাড়া-খাটিয়ে ধনবিজ্ঞানী, মিলে এ-বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায় তৈরি করেছেন। বহু তথ্যের সমাবেশ, অনেক অর্থনৈতিক কূট আলোচনা, বিভিন্ন দেশে বা অঞ্চলে কী প্রণালীতে এগোলে সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না, উৎপাদনও বাড়বে বণ্টনও সুষমতর হবে, তা নিয়ে বিস্তৃত-বিন্যস্ত নানা প্রস্তাব, কর্তব্যকর্মাদির পারস্পরিক অগ্রাধিকার নিয়ে মন্তব্য।

বই লিখে স্রেফ ভালো কথার বন্যা বইয়ে পৃথিবীর প্রকৃতি বদলানো সম্ভব নয়। বিশ্ব ব্যাঙ্ক ভালো-ভালো কথাগুলি কেন বলছেন, তা নিয়েও অবশ্য

সংশয় জাগতে পারে। ইন্দিরা গান্ধি যেমন ভালো-ভালো কথা বলেন, তার পর গরিবদের উপর লাঠি-গুলি চালান, সেরকম বিশ্ব ব্যাঙ্ক তথা ম্যাকনামারা হয়তো ভাবতে পারেন এই আধুনিক পৃথিবীতে শোষণের-দোহনের রীতি একটু পাল্টে নেওয়া দরকার, অন্যথা সবাই দুয়ো দেবে। অথবা এমনও হ'তে পারে দূরদর্শী ম্যাকনামারা এটা ভেবে দেখেছেন যে অনুন্নত দেশের গরিবদের জন্য যদি আদৌ কিছু করা না হয়, তা হ'লে বিদ্রোহের আশঙ্কা, বিশ্বব্যাপী বিপ্লবের আশঙ্কা, ধনতন্ত্রের নাভিশ্বাস দেখা দিতে পারে তা হ'লে: তার চেয়ে আপাতত সামান্য-কিছু দিয়ে-থুয়ে গরিবদের খুশি রাখা যাক, তাদের যে ক'রেই হোক বিদ্রোহ থেকে বিরত করতে হবে, সুতরাং, নিজেদের স্বার্থেই, এখানে-ওখানে তোমরা যে-যত ধনতন্ত্রের পরিজন আছ, দরিদ্রতরদের একটু তোয়াজ করতে শেখো, নিজেদের দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থের কথা ভেবেই শেখো।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য হয়তো সাধু, হয়তো অসাধু। সে-ব্যাপারে আপাতত মাথা ঘামিয়ে বিশেষ লাভ নেই। কিন্তু মুশকিল হলো বিশ্ব ব্যাঙ্কের কর্তারা যদিও সুদের হিশেব খুব ভালো বোঝেন, ইতিহাসের পাটীগণিত আদৌ বোঝেন না। ধনবণ্টনে কী ক'রে সৌষাম্য আসতে পারে, বাড়তি উৎ-পাদনের মহত্তর অংশ কী ক'রে দরিদ্রদের ভাগে পড়তে পারে, ইত্যাদি নিয়ে এ-বইতে অনেক পরিকল্পনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এই পরিকল্পনাগুলি কার্যকর করার জন্য বিশ্ব ব্যাঙ্কের সাহায্যও যথাযথ উদার থাকবে তা-ও ধ'রে নেওয়া যায়। কিন্তু মুশকিল হলো সর্ষের ভেতর ভূত থাকলে কী করা তা নিয়ে যে-পণ্ডিতরা এই গ্রন্থের অধ্যায়গুলি রচনা করেছেন আদৌ আলোচনা করেননি। একটি অধ্যায়ের শিরোনামা The Political Framework, কিন্তু তাতে মূল সমস্যার উপর আদৌ আলোকপাত নেই। শোষণ যাঁদের ধর্ম, নীতিকথায় তাঁরা অন্যচারী হবেন না। এমনকি নিজেদের ভবিষ্যৎ স্বার্থের কথা ভেবেও হবেন না। এই অধ্যায়ের লেখক সখেদে মন্তব্য করেছেন: The course is not lost at the outset, but it will not readily triumph।

আর্থিক অসাম্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সহজ জয়লাভ সম্ভব নয়, তার কারণ, বিশ্ব ব্যাঙ্ক কথাটা যতই ঢেকে-ঢেকে বলুন-না কেন, সমাজ শ্রেণীবিভক্ত। ধনবণ্টনের সমস্যা শ্রেণীবিভাজনের সমস্যা, শ্রেণীসংঘর্ষের সমস্যা। পণ্ডিতরা বিধান দিলেন, আর আমি সুবোধ বালকের মতো শোষণ-অত্যাচার বন্ধ ক'রে দিলাম, এরকম

হ'তেই পারে না। সুতরাং শেষ পর্যন্ত বিশ্ব ব্যাঙ্কের পণ্ডিতদের ব্যর্থমনস্কাম হ'তেই হবে।

তা হ'লেও এই গ্রন্থটি পুরোপুরি উপেক্ষণীয় নয়। পৃথিবীর প্রকৃতি দ্রুত বদলাচ্ছে, শোষণের প্রকৃতি-প্রকরণও। বিশ্ব ব্যাঙ্কের উপরও এই প্রবহমানতার প্রভাব পড়ছে। ব্যাঙ্কের পরিচালনায় মার্কিন রাষ্ট্রশক্তির ক্ষমতা প্রয়োগ আপাতত ক্ষীয়মাণ। অনুন্নত দেশের প্রতিনিধিরা তাঁদের গলা অনেকটা চড়িয়েছেন, যুগোস্লাভিয়াকে যদিও পুরো সমাজতান্ত্রিক দেশ ব'লে আর চেনা যায় না তা হ'লেও সে-রাষ্ট্র বিশ্ব ব্যাঙ্কের একজন জাঁকিয়ে-বসা সদস্য। একেবারে হালে রুমানিয়া ব্যাঙ্কের সদস্যপদ গ্রহণ করেছে এবং চীনকে সদস্য হবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে কি হবে না তা নিয়ে জল্পনা চলছে। জীবনধারার ছাপ চেতনাকে গড়ে—পাল্টায়, সুতরাং বিশ্ব ব্যাঙ্কের চেতনার উপরও বাইরের পরিবর্তনের ছায়ার প্রতিফলন ঘটবে, ইতিহাসের নিয়ম মেনেই ঘটবে। প্রারম্ভিক মানসিকতা সততাব্যাঞ্জক হোক না-হোক, এই গ্রন্থ তাই বিশেষ এক প্রবণতার দ্যোতক। বিশ্ব ব্যাঙ্কের শিক্ষার হয়তো এই সবে শুরু, তার শেষ কোথায় তা জানবার জন্য আমাদের প্রতীক্ষায় থাকতে হবে। ইতিমধ্যে ইতিহাস এগোবে, পৃথিবীতে বিপ্লবের রথঘর্ঘর ক্রমশ আরো উচ্চকিত হবে।

১৯৭৫

দেশকে কী ক'রে বিকোতে হয়

আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ড (International Monetary Fund) থেকে ভারত সরকার সাড়ে পাঁচ হাজার কোটি টাকারও বেশি ঋণ চেয়ে সম্প্রতি যে-আবেদন করেছেন, তা নিয়ে মস্ত সংশয়-বিতর্ক-প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। ভারত সরকার এর আগে কখনো এক সঙ্গে এই পরিমাণ বৈদেশিক ঋণ ভিক্ষা করেননি, আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ড থেকেও এখন পর্যন্ত এক সঙ্গে এই পরিমাণ ঋণ কোনো দেশকে দেওয়া হয়নি। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে শুরু ক'রে বিগত চৌত্রিশ বছরে সর্বসাকুল্যে ভারত সরকার বিদেশ থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন পনেরো হাজার কোটি টাকার মতো। যদি আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ড থেকে প্রার্থিত ঋণ এসে পৌছয়, তা হ'লে এক ধাক্কায় তা এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি বেড়ে কুড়ি হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে, এবং যার পরিণাম ভবিষ্যতে ভোগ করতে হবে গোটা দেশ ও জাতিকে। সুতরাং প্রস্তাবিত এই ঋণের চরিত্র ও শর্তাবলী নিয়ে বিস্তৃত বিশ্লেষণ ও আলোচনা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

একটু ইতিহাসে ফিরে যেতে হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্তিমলগ্নে পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদী তথা ধনতান্ত্রিক দেশগুলির শাসকবর্গ বুঝতে পারছিলেন, তাঁদের দিন ফুরিয়ে আসছে, নাৎসী বর্বরতার বিরুদ্ধে সোভিয়েট প্রতিরোধের যুগান্তকারী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, পাশাপাশি পূর্ব ইওরোপের দেশগুলিতে যুগপৎ নাৎসী আগ্রাসন তথা আভ্যন্তরীণ সামন্ততান্ত্রিক-ধনতান্ত্রিক শক্তিবৃন্দের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ লৌহ-কঠিন গণঅভ্যুত্থান, অন্যদিকে কমিউনিস্ট পার্টির মহান্ নেতৃত্বে চীনদেশে সর্ব-শোষণউৎপাটনকারী বিপ্লবের সাফল্যের প্রায় শিখরে পৌছনো, সব-মিলিয়ে যে-পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছিল তা থেকে এটা স্পষ্ট যে ধ্রুপদী কায়দায় আন্তর্জাতিক শোষণ-পীড়নের ঋতুর অবসান অত্যাসন্ন, সোভিয়েট-চীন-পূর্ব ইওরোপের গৌরবোজ্জ্বল উদাহরণে উদ্দীপ্ত হয়ে এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার জনগণ সর্বপ্রকার পরাধীনতা-শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য কৃতসংকল্প, সাম্রাজ্যবাদী-ধনতান্ত্রিক শক্তিগুলির কোনো ক্ষমতা অবশিষ্ট নেই যে জোর ক'রে এই মুক্তির

অদম্য বাসনাকে চাপা দিয়ে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে পারে। ইংরেজ-ফরাশি-ওলন্দাজ-বেলজিয়ান-মার্কিন সবাইকেই তাই পরাধীন-অনুন্নত-এতদিন-পর্যন্ত অবলীলায়-শোষিত দেশগুলি থেকে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক আধিপত্য প্রত্যাহার করতেই হবে, যারা স্বেচ্ছায় করবে না পরিস্থিতি তাদের বাধ্য করবে, সবাইকেই ঠেকে শিখতে হবে তাদের দিন বিগত। এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার মানুষ দৃঢ়কল্প, তারা ছিনিয়ে নেবে তাদের জন্মগত অধিকার, শোষণমুক্ত জীবনের অধিকার, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি তাদের প্রেরণা জোগাবে, অভয় জোগাবে। সুতরাং কুরুক্ষেত্রে যেমন ক্লীবের পন্থা ধরা হয়েছিল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখনো শেষ হয়নি, ১৯৪৪ সাল, পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদী-ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সরকার-গুলি নতুন কৌশল অবলম্বনের কথা ভাবলেন। তাঁরা দুটি আলাদা আন্তর্জাতিক অর্থসংস্থার প্রস্তাব পাড়লেন। একটি আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ড – International Monetary Fund – অন্যটি আন্তর্জাতিক পুনরুজ্জীবন তথা উন্নয়ন ব্যাঙ্ক – International Bank for Reconstruction and Development, যা সংক্ষিপ্ত আকারে এখন বিশ্ব ব্যাঙ্ক – World Bank – নামে অধিকতর পরিচিতি লাভ করেছে। প্রচুর শুনতে-ভালো এমন কথা তখন বলা হলো; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে, ইওরোপে ও অন্যত্র, দেশের-পর-দেশ জরাজীর্ণ ছিন্নভিন্ন বিদীর্ণ অবস্থায় পৌঁছেছে, তাদের সুস্বাস্থ্যে ফিরিয়ে আনতে হবে। তা ছাড়া, নতুন যুগ আসছে, অচিরেই অনেক-অনেক দেশ, আফ্রিকায়-এশিয়ায়-দক্ষিণ আমেরিকায়, স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছবে। তারা অনুন্নত, দারিদ্র্যের ভারে নুয়ে-পড়া, তাদের অন্ধকারের মলিনতা থেকে ঝিকিমিকি রোদ্দুরের পরিমণ্ডলে পৌঁছে দিতে হবে। অতএব সবারে করি আহ্বান; আসুন সবাই, বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডের সদস্যপদ গ্রহণ করুন, যাঁরা উন্নত হ'তে চান, তাঁরা, যাঁরা অন্যদের উন্নতিবিধান করতে চান, তাঁরা, প্রত্যেকেই দলে-দলে যোগ দিন।

এই নিমন্ত্রণলিপিতে অবশ্য একটি মস্ত ফাঁকি থেকে গেল। সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জে ছোটো-বড়ো, ধনী-দরিদ্র সব দেশেরই সমান অধিকার, প্রত্যেক দেশেরই একটি ক'রে ভোট, যে-সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া হয় সেগুলিতে তাই কোনো বিশেষ রাষ্ট্রের বা রাষ্ট্র সরকারের বাড়তি প্রভাব খাটানোর কোনো প্রশ্ন নেই। সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের সফলতা-বিফলতার প্রসঙ্গে না গিয়েও তাই বলা চলে যে, অন্তত গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রতিফলন ঘটেছে এই প্রতিষ্ঠানের ক্রিয়াকর্মে। কিন্তু

আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ড ও বিশ্ব ব্যাঙ্কের উদ্যোক্তারা ও-পথ দিয়েও মাড়ালেন না। সব দেশকে তাঁরা সদস্যপদ গ্রহণের জন্য আহ্বান করলেন, কিন্তু সমান অধিকার দেওয়ার কথা বললেন না। এই দুই সংস্থার প্রারম্ভিক মূলধনে কোন্ দেশের কতটা অংশ থাকবে তা তাঁরা আগে থেকে নিরূপণ ক'রে দিলেন; সঙ্গে-সঙ্গে এটাও ঘোষণা ক'রে দিলেন, সংস্থাদ্বয়ের সমস্ত সিদ্ধান্ত যদিও সকলের ভোটেই স্থির হবে, প্রারম্ভিক মূলধনের অংশের আনুপাতিক হারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন দেশের ভোটের পরিমাণ নির্ণয় করা হবে। অর্থাৎ সব দেশের সমান ভোট নয়, কারো-কারো ভাগ্যে বেশি ভোট, কারো-কারো ভাগ্যে কম।

প্রারম্ভিক মূলধনের সিংহভাগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহযোগী অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশগুলি—ক্যানাডা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, দক্ষিণ আফ্রিকা, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড ইত্যাদি—নিজেদের মধ্যে বাঁটোয়ারা ক'রে নিলেন; একা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রায় ৪০ শতাংশ মূলধনের অংশীদার হয়ে রইলেন। সুতরাং আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্থা এবং বিশ্ব ব্যাঙ্ক উভয় সংস্থার ক্ষেত্রেই সমস্ত সিদ্ধান্তের নিয়ামক একেবারে প্রথম থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ও তার সমাদর্শাবলম্বী রাষ্ট্রগুলি। ব্যাপারস্যাপার হৃদয়ঙ্গম ক'রে সোভিয়েট ইউনিয়নের কর্তৃপক্ষ এই সংস্থাদ্বয়ের সদস্যপদ গ্রহণে অসম্মতি জানালেন। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে প্রথম দিকে চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোল্যাণ্ড ফাণ্ড ও ব্যাঙ্কের সদস্য ছিলেন, কিন্তু তাঁদের অচিরে মোহভঙ্গ হয়; ১৯৪৭ সালে এই দুই দেশের সরকারই সদস্যপদ প্রত্যাহার ক'রে নেন। কমিনফর্মের সঙ্গে মতদ্বৈধতার পর ১৯৪৮ সালে যুগোস্লাভিয়া সরকার ফাণ্ড তথা ব্যাঙ্কে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক সময়ে—১৯৭৪ সালে—রুমানিয়া ফাণ্ড-ব্যাঙ্কে যোগদান করেছে; তারও পরে, ১৯৭৭ সালে, মার্কিন-বিজয়ী ভিয়েতনাম, এবং সবশেষে ১৯৭৯ সালে চীন। (চীনের ক্ষেত্রে অবশ্য যোগদানের ব্যাপারটি ঈষৎ আলাদা। সেই ১৯৪৪ সাল থেকেই চীন ফাণ্ড-ব্যাঙ্কের সদস্য। কিন্তু এতদিন উভয় সংস্থায়ই চীনের প্রতিনিধিত্ব করছিল তাইওয়ানের কুয়োমিনটাং মতাবলম্বী শাসককুল: এতদিন বাদে সেই পর্যায়ের অবসান ঘটানো হয়েছে।) অন্যদিকে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসদস্যদের পাল্লা ভারী হয়েছে বিশেষ ক'রে পশ্চিম জার্মানি ও জাপানের পরম পরাক্রান্ত আবির্ভাবহেতু।

সাম্রাজ্য অস্তগত, কিন্তু অন্য বিভঙ্গে শোষণ অব্যাহত রাখতে হবে:

পশ্চিমের ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রশক্তিগুলির এই লক্ষ্য পূরণের প্রধান অস্ত্র হিশেবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর সময়ে ফাণ্ড-ব্যাঙ্ককে ব্যবহার করা হয়েছে। সংস্থা-দু'টি পরস্পরের পরিপূরকরূপে কাজ ক'রে এসেছে। গরিব দেশগুলি যাতে দ্রুত উন্নতি করতে পারে তার জন্য বিশ্ব ব্যাঙ্ক থেকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কিন্তু এ-ধরনের ঋণ পেতে পারে একমাত্র সদস্যরাষ্ট্ররাই, এবং ব্যাঙ্কের নিয়মাবলীতে সুস্পষ্ট নির্দিষ্ট যে-রাষ্ট্র ফাণ্ডের সদস্য নয়, তাকে ব্যাঙ্কের সদস্য হিশেবে গ্রহণ করা হবে না। অতএব ব্যাঙ্কের কাছ থেকে উন্নয়নবিধায়ক ঋণ পেতে হ'লে তার আগে ফাণ্ডের সদস্য হ'তেই হবে ও ফাণ্ডের সমস্ত অনুশাসন মেনে নিতে হবে। এটা অনেকটা সেই প্রাবচনিক গল্পের গাজর-লাঠি সম্পর্ক: লাঠির আগায় বিশ্ব ব্যাঙ্কের দীর্ঘমেয়াদী ঋণের লোভ-জাগানো গাজর; কিন্তু তা নাগালের বাইরেই থাকবে, যদি-না ফাণ্ড যে-যে কঠিন কৃচ্ছ্রসাধন ও শর্তের কথা বলছে, সুবোধ গাধার মতো তা মেনে নাও।

ফাণ্ডের নিয়মধারায় সদস্য রাষ্ট্রগুলির অর্থ-ও-মুদ্রাব্যবস্থার পর্যবেক্ষণ-তথা-তত্ত্বাবধানের দায়িত্বের কথা বলা আছে। এই দায়িত্ব পালনের অছিলায় ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির স্বার্থ সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের মস্ত সুযোগ ফাণ্ডের করতলগত, এবং এই সুযোগ গত পঁয়তিরিশ বছর ধ'রে উক্ত সংস্থা পুরোপুরি ব্যবহার ক'রে এসেছে। ব্যবস্থায় কোনো ফাঁক নেই। পাশ্চাত্যের দেশগুলি নিজেদের মধ্যে সেই শুরু থেকেই ঘরোয়া বন্দোবস্ত ক'রে নিয়েছেন। দুই সংস্থার গঠনতন্ত্র বা নিয়মাবলীতে কোনো লিখিত নির্দেশ নেই। তা হ'লেও এটা সুস্থির করা আছে যে বিশ্ব ব্যাঙ্কের সভাপতি বরাবরই হবেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো নাগরিক, ফাণ্ডের প্রধান পুরুষ হবেন পশ্চিম ইওরোপের কোনো দেশের কেউ, এবং মূলধনে অধিকতর অংশের জোরে দুই সংস্থার পরিচালকমণ্ডলীতে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির প্রাধান্য চিরকাল অটুট থাকবে। এই পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে গরিব অনুন্নত দেশগুলি ফাণ্ড ও ব্যাঙ্কের সদস্যপদে বৃত হচ্ছে। তাদের অনেক অভাব, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে তাদের শোষণ করেছে, ছিবড়ে ক'রে রেখে গেছে তাদের অর্থব্যবস্থা, এখন দেশ পরাধীনতা-মুক্ত হয়েছে, দেশকে নতুন ক'রে গড়তে হবে, গড়তে গেলে মূলধন চাই, মূলধনের ব্যবস্থা হ'তে পারে বিশ্ব ব্যাঙ্কের কাছ থেকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ গ্রহণ করলে। কিন্তু বিশ্ব ব্যাঙ্কের ঋণের পূর্বশর্ত ফাণ্ডের সদস্য হওয়া, অতএব ফাণ্ডের সমস্ত অনুশাসন ও তত্ত্বাবধান মাথা পেতে না নিলে উপায় নেই।

এখানেই নবসাম্রাজ্যবাদের লীলাকলার সম্পূর্ণ পরিচয় প্রকাশ। ফাণ্ড সদস্য-দেশগুলির মুদ্রা ও অর্থব্যবস্থার তত্ত্বাবধান করবে, উপদেশাদি দান করবে, তার বিবেচনায় এখানে-ওখানে ক্রটি দেখা গেলে তা সংশোধনের জন্য বুদ্ধিপরামর্শ দেবে। যে-দেশ বিত্তবান, নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা যার আছে, টিঁকে থাকবার জন্য অন্যের কাছে যাকে হাত পাততে হয় না, কিংবা যে-দেশে সফল সমাজবিপ্লবহেতু চরিত্রদৃঢ়তা সুপ্রোথিত, সেই দেশ স্বচ্ছন্দে ফাণ্ডের ঢালাও উপদেশ-অনুজ্ঞা উপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু পৃথিবীর বেশির ভাগ দরিদ্র অনুন্নত দেশেরই পরিস্থিতি অন্যরকম। দারিদ্র্যহেতু সঞ্চয়ের পরিমাণ কম, অথচ দেশকে যদি দ্রুত বিকাশের পথে নিয়ে যেতে হয় তা হ'লে বিনিয়োগ প্রয়োজন, সে-বিনিয়োগের টাকা আসতে পারে বাইরে থেকে। সাম্রাজ্যবাদীরা কোনো শিল্পকাঠামো তৈরি ক'রে রেখে যায়নি, এখন শিল্পপ্রসার যে ক'রেই হোক ঘটাতেই হবে, তার জন্য প্রয়োজন যন্ত্রপাতির, যা-ও একমাত্র বাইরে থেকে আসতে পারে; যেহেতু ভূমিসংস্কার হয়নি, কৃষি উৎপাদনও রুদ্ধগতি, অনেক ক্ষেত্রে তাই এমনকি খাদ্যশস্য পর্যন্ত বিদেশ থেকে আমদানি না ক'রে উপায় নেই, যার জন্য ফের প্রয়োজন বৈদেশিক মুদ্রার। বিদেশ থেকে মূলধন তথা সামগ্রীর আমদানি বাড়াতে হয়, সামগ্রিক আমদানি বাড়ে, কিন্তু রপ্তানি সেই অনুপাতে বাড়ে না। গরিব দেশগুলি যা-যা রপ্তানি করতে পারে তা প্রধানত খনিজ-কৃষিজাত পণ্যাদি। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগসূত্র যদি স্থাপিত না হয়ে থাকে, তা হ'লে এই রপ্তানি হ'তে পারে শুধু পশ্চিমের ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে; তারা মওকা বুঝে গরিব দেশগুলির উপর অনেকরকম বিধিনিষেধ আরোপ করে, কৃষিজাত ও খনিজ দ্রব্যাদির দাম কমিয়ে আনে, ফলে গরিব দেশগুলিকে নাকানিচুবুনি খেতে হয়। তাদের রপ্তানি তেমন বাড়ে না, আমদানি কিন্তু বাধ্যত বেড়েই চলে। তাই বহির্বাণিজ্যে ঘাটতি দেখা দেয়, বৈদেশিক মুদ্রার অভাব প্রকট থেকে প্রকটতর হয়।

এ-সমস্ত সংকটের মুহূর্তে পরিত্রাতার ভূমিকায় ফাণ্ডের আসরে অবতীর্ণ হওয়ার রেওয়াজ। বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবস্থা না করতে পারলে বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি আসা বন্ধ হয়ে যাবে, শিল্পব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। এমনকি ন্যূনতম প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য পর্যন্ত আমদানি করা অসম্ভব হবে, দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে, তা থেকে হয়তো নৈরাজ্য। উন্নয়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ঋণের স্বপ্ন শিকেয় তোলা থাক্, আপাতত যা সবচেয়ে বড়ো প্রয়োজন তা তাৎক্ষণিক ঋণ, বৈদেশিক

মুদ্রায়, যার ব্যবস্থা করা ফাণ্ডের কার্যাবলীর মধ্যে পড়ে, ফাণ্ড নিজের ভাণ্ডার থেকে সাময়িকভাবে যার ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারে। কিন্তু ফাণ্ডের কাছ থেকে যদি এ-ধরনের স্বল্পকালীন ঋণ চাও, তা হ'লে ভালো ছেলে বনতে হবে তোমাদের, ফাণ্ডের কথাবার্তা শুনতে হবে, ফাণ্ডের নির্দেশ মানতে হবে। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, ফাণ্ডের কর্তা ধনতান্ত্রিক দেশগুলি, সে-দেশগুলির শাসককুলের অনুজ্ঞা-অনুযায়ী এ-সব ক্ষেত্রে গরিব দেশগুলির উপর কী-কী শর্ত চাপানো হবে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ তালিকা ফাণ্ড গত পঁয়তিরিশ বছর ধ'রে সম্পূর্ণ করেছে, একটির-পর-একটি হতভাগ্য দরিদ্র রাষ্ট্রের উপর তা প্রয়োগ করেছে, নবসাম্রাজ্যবাদকে দীর্ঘজীবী করার সামগ্রিক প্রয়াস তাতে বিধৃত। হ্যাঁ, ফাণ্ড দয়ার আকর, তোমরা বিপদে পড়েছো, ফাণ্ড সাময়িকভাবে বৈদেশিক মুদ্রা ঋণ দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবে, কিন্তু তার আগে ভ্যাঁ করো তো বাপু। বৈদেশিক মুদ্রায় তোমাদের ঘাটতির উৎসসন্ধানে যেতে হবে। তোমাদের আমদানি বেশি হচ্ছে, তুলনায় রপ্তানি কম হচ্ছে কেন; আমদানি বাড়ার, রপ্তানি আশানুরূপ না-বাড়ার, হেতু কী; সরকারের খরচ যদি কমিয়ে আনো, তা হ'লে মনে হয় আমদানির বহর কমবে; তা ছাড়া, সরকারি খরচ কমালে, হয়তো দেশে জিনিশপত্রের চাহিদাও কমবে, তা হ'লে কিছু-কিছু জিনিশ উদ্বৃত্ত হবে, যা বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব। এবং ভেবে ছাখো, যদি সরকারি ব্যয়-সংকোচ না-ঘটে, বাজেটে ঘাটতি অব্যাহত থাকবে, যার পরিণাম নোট-ছাপানো, যার ফলে জিনিশপত্রের দাম হু-হু ক'রে বাড়বে, এত দাম দিয়ে তোমাদের দেশের জিনিশ বিদেশীরা কেন কিনবে, সুতরাং তোমাদের রপ্তানি আরো কমবে, তোমাদের সংকট গভীরতর হবে। সেই চরম বিপদের হাত থেকে যদি রক্ষা পেতে চাও, সরকারি খরচ কমাও। সরকারি কোন্ খরচ কমাবে? তা-ও বলে দিচ্ছি তোমাদের, ফাণ্ডের কাছে আগে থেকেই পুরো তালিকা তৈরি আছে। যে-যে খরচ রপ্তানি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে না, সে-সমস্ত ছাঁটতে হবে; যথা, জনশিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, জনহিতকর কর্মসূচী তা যাই হোক-না কেন। তোমাদের নির্দয় হ'তে হবে। গরিব মানুষদের জন্য পয়সা ঢেলে আপাতত কোনো লাভ নেই, বরঞ্চ ক্ষতি, তারা তো রপ্তানি বাড়াতে সাহায্য করবে না।

ফাণ্ডের উপদেশামৃত অবশ্য এখানেই থেমে থাকে না। রপ্তানি বাড়াতে গেলে উৎপাদন বাড়াতে হয়, সুতরাং তোমাদের এমন-ধারা কাজ করতে হবে

যাতে উৎপাদকরা—তা তাঁরা জমিদার-জোতদারই হোন কিংবা কলকারখানার মালিকই হোন—উৎসাহবদ্ধ হন। খরচ নিশ্চয়ই কমাবে, কিন্তু সেটা গরিবদের ধনেপ্রাণে মেরে, কদাচ বড়োলোকদের অনিষ্ট ঘটিয়ে নয়। বরঞ্চ যাতে তাঁরা উৎপাদন-বৃদ্ধিতে অনুপ্রেরণা পান, শিল্পপতিদের, ভূস্বামীদের, ধনী কৃষকদের নিত্যনতুন অনুদান দেওয়া তোমাদের কর্তব্য। তাঁদের উপর, খবরদার, কোনো বাড়তি করের বোঝা চাপাবে না, বরং ছাখো, এখানে-সেখানে কোনো করের হার একটু কমিয়ে অথবা পুরোপুরি রদ ক'রে দিতে পারো কিনা। তা ছাড়া, সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখবে যাতে তাঁরা তাঁদের উৎপাদিত পণ্যাদির জন্য ভালো দাম পান, দরকার হ'লে সরকার থেকে পূর্বাহ্নে ভালো দাম ঘোষণা ক'রে সে-সমস্ত পণ্য কেনারও ব্যবস্থা রেখো। এবং এ-ধরনের পণ্য বিদেশে রপ্তানি ক'রে যাঁরা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করবেন, যাতে উৎসাহে উদ্দীপ্ত হতে পারেন সেই ব্যবসাদাররা, তাঁদের জন্য রপ্তানি-অনুদানের ব্যবস্থাও রাখতে হবে তোমাদের। রপ্তানি বাড়াও, উৎপাদন বাড়াও, উৎপাদনের পথে কোনো বাধানিষেধ আরোপ করা চলবে না। ও-সব ভূমিসংস্কারটংস্কার আপাতত শিকেয় তুলে রাখো। বড়ো জমিদারদের কৃষিউৎপাদনে উৎসাহ দাও, বড়ো-বড়ো শিল্পপতিদের উপর চাপানো সমস্ত নিয়মনিগড় শিথিল ক'রে তাঁদের ব্যবসাবাণিজ্য প্রসারের সমস্ত-রকম সুযোগ ক'রে দাও। তোমাদের তো বৈদেশিক মুদ্রা চাই, তবে বিদেশীদের সম্পর্কে অযথা ছুঁতমার্গ থেকে ভুগছো কেন, অনেক বাঘা-বাঘা বিদেশী প্রতিষ্ঠান তোমাদের দেশে বিনিয়োগ করার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে—তোমাদের এখানে কাঁচামাল সস্তা ও সুলভ, মজুরির হারও এত কম—তাদের আসতে দাও, খ্যামটা নাচতে নেমে আবার ঘোমটা দেওয়া কেন। আর-একটা কথা, তোমাদের দেশের মজুরশ্রেণীকে বেশি প্রশ্রয় দিয়ো না; তারা লাই পেয়ে মাথায় চ'ড়ে বসলে পুঁজিপতিরা উৎপাদনে উৎসাহ পাবেন না, তাতে তোমাদেরই সমূহ ক্ষতি।

এ বড়ো জটিল-কুটিল পাটীগণিত। কারণ ফাণ্ডের তূণে আরো বাণ আছে। ধ'রে নিন উপরের যে-সমস্ত আজ্ঞা-অনুশাসন-নির্দেশ ফাণ্ডের কাছ থেকে পাওয়া গেল, তা সব-ক'টি মেনে নেওয়া হলো। গরিবদের পিষে মারা হলো, বড়ো-লোকদের সবরকম সুবিধা ক'রে দেওয়া হলো, তা সত্ত্বেও অবস্থার কোনো হেরফের নেই, রপ্তানি বাড়ছে না, আমদানি কমছে না, বৈদেশিক মুদ্রার সংকট থেকেই যাচ্ছে, তখনু ফাণ্ড—আমাদের নিজেদের এবং অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতায় দেখা

গেছে—একটি মোক্ষম শেষ অস্ত্র ঝাড়বে। ও হরি, তোমাদের গোড়ায় গলদ, তোমাদের রপ্তানি বাড়ছে না—আমদানি কমছে না তার কারণ বিদেশী মুদ্রাদির সঙ্গে তোমাদের টাকার হার তোমরা অস্বাভাবিক চড়িয়ে রেখেছো, যার ফলে বিদেশে তোমাদের দেশের জিনিশের দাম অত্যন্ত বেশি, ও-দামে কেউ কিনতে চাইছে না, আর তোমাদের দেশে বিদেশী জিনিশের দাম অপেক্ষাকৃত কম, তোমরা হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে বিদেশী জিনিশ কিনছো। এই মৌলিক অসামঞ্জস্য (fundamental disequilibrium) অপসারণের একটাই উপায়: তোমাদের টাকার মূল্য হ্রাস করতে হবে, যার ফলে বিদেশে তোমাদের জিনিশ সস্তা হবে, আর সেই সঙ্গে অনেক বেশি দাম দিয়ে বিদেশী জিনিশ কিনতে তোমরা বাধ্য হবে, পরিণামে একদিকে তোমাদের রপ্তানি বাড়বে, আমদানি কমবে।

উপনিবেশ গেছে, সাম্রাজ্য গেছে, কিন্তু কৌশল ক'রে, ফাণ্ড-ব্যাঙ্কের শর্তাবলীর জালে জড়িয়ে, উপনিবেশ-সাম্রাজ্যাদি থেকে যে সুখসুবিধাগুলি পাওয়া যেতো, সেগুলি বজায় রাখার এক পরিব্যাপ্ত চক্রান্ত এটা। আমাদের শর্ত মানো, তা হ'লে সাময়িকভাবে বৈদেশিক মুদ্রা ধার দেবো তোমাদের, নইলে নয়। আর যদি ফাণ্ডের কথামতো চ'লে তোমার দেশের অর্থব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ সংস্কার করতে রাজি না থাকো, তা হ'লে বিশ্ব ব্যাঙ্ক থেকেও কোনো দীর্ঘমেয়াদী ঋণ তোমাদের প্রাপ্য হবে না। সুবোধ বালকের মতো আমাদের কথা শুনে চললে তোমাদের কোনো ভয় নেই, তোমাদের সব মুশকিলের অবসান হয়ে যাবে। আর যদি তা না শোনো, তা হ'লে সুকুমার রায়ের সেই ছড়ার মতো: অভয় দিচ্ছি শুনছো না যে, ধরব নাকি ঠ্যাং-দু'টা বসলে তোমার মুণ্ড চেপে বুঝবে তখন কাণ্ডটা।

গত তিরিশ-পঁয়তিরিশ বছর জুড়ে ফাণ্ড এবং ব্যাঙ্ক এমন ধারা-প্রথায় অনেক দরিদ্র বিকাশোন্মুখ রাষ্ট্রের মুণ্ড চেপে ধরেছে, সে-সমস্ত রাষ্ট্রের ঢাকের দায়ে মনসা বিকিয়েছে। অবশ্য ফাণ্ড সব দেশের ক্ষেত্রে সব ঋতুতে হুবহু ঠিক একই ধরনের চতুরালির আশ্রয় নেয় না; অনেকটাই অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। যেখানে কোনো সদস্যরাষ্ট্রের সামান্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন, ফাণ্ড সেখানে শর্তাবলী নিয়ে তেমন-কিছু জোর করবার সুযোগ পায় না। কী-কী শর্ত প্রয়োগ করা হবে তা অনেকটাই নির্ভর করে সাময়িকভাবে কতটা ঋণ ফাণ্ডের কাছে চাওয়া হচ্ছে, তার উপর। ফাণ্ডের মূলধনে প্রতি সদস্য রাষ্ট্রের যে-পরিমাণ অংশ আছে, তার সঙ্গে সমতা রেখে প্রত্যেক দেশের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ঋণের

একটি অঙ্ক (quota) নির্দিষ্ট করা থাকে। সেই অঙ্কের মধ্যে প্রয়োজনীয় ঋণের হিশেব হ'লে তেমন অসুবিধা নেই। কিন্তু সেই অঙ্কের বাইরে প্রয়োজনের পরিমাণ যতো বাড়ে, ফাণ্ডের শর্তাবলী তত কঠিন থেকে কঠিনতর হ'তে থাকে। অন্য কতকগুলি প্রশ্নও এখানে এসে যায়। যে-সদস্যরাষ্ট্রের আত্মবিশ্বাস যত কম, ফাণ্ডের গুরুমশাইগিরি তার উপর খাটাবার আশঙ্কা ততো বেশি। কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশকে ফাণ্ড খুব বেশি ঘাটাতে কখনোই সাহস পাবে না ; ফাণ্ডের কর্তৃপক্ষ এটা ভালো ক'রেই জানেন, যে-সব দেশের জনসাধারণের নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার মতো শক্তি বা সম্ভাবনা আছে, সাময়িকভাবে ঋণদানের উপলক্ষে কোনো অনিষ্টকারী বা অবমাননাকারী শর্ত ফাণ্ড চাপাতে চাইলে সে-সব ক্ষেত্রে গোটা দেশের মানুষ তা হয়তো ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করবেন, চাই কি ফাণ্ডের সদস্যপদ পর্যন্ত ছুঁড়ে ফেলে দেবেন, কয়েকটা দিন ঈষৎ অসুবিধার মধ্যে পড়লেও বৈদেশিক ঋণের মোহ কাটিয়ে নিজেদের আর্থিক ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস ক'রে সংকটের যথাসম্ভব সূত্র সন্ধান করবেন ; ফাণ্ড সুতরাং সমাজতান্ত্রিক সদস্য রাষ্ট্রগুলির উপর কোনো অন্যায় শর্ত চাপাবার কথা চিন্তাও করবে না। কিংবা অন্য কোনো সদস্যরাষ্ট্র, যেখানে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এখনো অনারব্ধ, কিন্তু সুসংহত জাতীয়তাবাদের সুদৃঢ় সংস্থান আছে, সে-দেশের ক্ষেত্রেও ফাণ্ড একটু সমীহ ক'রে কথা বলবে। ফাণ্ড কর্তৃপক্ষ এখানে ঠেকে শিখেছেন : বছর-ষোলো-সতেরো আগে ঘানার উপর কিছু-কিছু অযৌক্তিক শর্ত চাপাতে গিয়ে ভীষণ নাস্তানাবুদ হ'তে হয়েছিল ফাণ্ডকে, রাষ্ট্রপতি ন্‌ক্রুমা আফ্রিকার জাগ্রত জনতার কাছে সেই অপমানজনক শর্তাদি সম্পর্কে কী করণীয় সেই প্রশ্ন রেখেছিলেন, জনতার কাছ থেকে আশ্বাস ও অভয় পেয়ে ফাণ্ডকে সমুচিত জবাব দিয়েছিলেন, ফাণ্ড ভয় পেয়ে পিছিয়ে এসেছিল তখন। আরো সম্প্রতি, মাত্র কয়েক বছর আগে, তানজানিয়ার ক্ষেত্রেও ফাণ্ড ঋণ নিয়ে আলোচনা করার সময় জাতীয় স্বার্থের ঘোর পরিপন্থী কয়েকটি ন্যক্কারজনক প্রস্তাব রেখেছিল ; রাষ্ট্রপতি নাইরেরে দেশে মানুষের কাছে সেই শর্তাবলীর ধারা-উপধারা সমস্ত বিশদ ক'রে প্রকাশ করেছিলেন ; মাত্র এক কোটি মানুষের দেশ তানজানিয়া, কিন্তু তাদের সম্মিলিত রোষের মুখে ভয়ত্রস্ত হয়ে ফাণ্ড ঋণদানের শর্তগুলি অনেক নমনীয় ক'রে আনতে বাধ্য হয়েছিল।

এখানে একটি সদস্যরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ শ্রেণীচরিত্রের প্রসঙ্গ এসে যায়। যে-দেশ নিছক রাজনৈতিক অর্থে স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু মানসিকতার দিক থেকে

যে-দেশের কর্তাব্যক্তিরা হীনমন্যতায় ভুগছেন, অথবা যে-দেশের শ্রেণীবিন্যাস এমন যে গরিবরা নিষ্পেষিত-নিপীড়িত হ'তে থাকলে কর্তাব্যক্তিদের কিছু যায়-আসে না, ফাণ্ড ও বিশ্ব ব্যাঙ্ক সেই দেশে আসর জমিয়ে বসবে। সমাজবিপ্লব হয়নি, রাষ্ট্রশক্তি পুরোপুরি শিল্পপতি-জমিদার-ব্যবসাদারদের কুক্ষিগত, আমলা-তন্ত্রও ওই একই শ্রেণীভুক্ত, সুতরাং সস্তায় কিস্তি মাৎ, সেই সঙ্গে—এক ঢিলে দুই পাখি মারার মতো—দরিদ্রতর শ্রেণীকে আরো একটু অসুবিধায় ফেলার সুযোগ, এই উভয়বিধ লোভ সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে। দেশটা আমাদের কব্জায়, রাষ্ট্রশক্তি আমাদের হাতে এখন, আমাদের শ্রেণীস্বার্থ বিন্দু-মাত্র না-খুইয়ে দেশের অর্থব্যবস্থা যত দ্রুত সম্ভব পাকাপোক্ত করতে হবে; তার জন্য যে-সঞ্চয় প্রয়োজন, আমাদের শ্রেণীভুক্তরা তা করতে সম্মত নয়; অতএব, কী দরকার ঝামেলায়, বিদেশ থেকে মূলধন আসুক, ফাণ্ড থেকে, ব্যাঙ্ক থেকে, বিদেশী বে-সরকারি নানা প্রতিষ্ঠান থেকে; এটা সম্ভব হ'তে পারে যদি ওদের শর্তগুলি মেনে নেওয়া হয়; মেনে নিতে বাধা কী, আমাদের শ্রেণীস্বার্থ তো মোটেই ব্যাহত হচ্ছে না তাতে, ফাণ্ড বলছে জমিদারদের-পুঁজিপতিদের-ফাটকাবাজদের সুবিধা ক'রে দাও, আমাদের শ্রেণীর লোকেদের পয়মন্ত হবে, সুবিধা ক'রে দিচ্ছি: ফাণ্ড বলছে মজুরি বাড়তে দিয়ো না, দরকার হ'লে ধর্মঘট নিষিদ্ধ করো, আমাদের শ্রেণীস্বার্থের কথাই তো বলছে, মেনে নিতে বাধা কোথায়। ফাণ্ড বলছে বিদেশী পুঁজির সুবিধা ক'রে দাও, ভালোই তো হলো: আমাদের আর মূলধন-বৃদ্ধির জন্য আয়াস করতে হবে না, আমাদের শ্রেণীভুক্তদের উপর বাড়তি কর চাপাতে হবে না। ফাণ্ড বলছে আমাদের মুদ্রামূল্য হ্রাস করতে হবে; এটা অবশ্য একটু অসুবিধাজনক, কিন্তু ফাণ্ড যখন বাড়তি ঋণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেই, তখন না-হয় জাতীয় স্বার্থ একটু বিসর্জনই দেওয়া হোক··· কে না জানে কষ্ট ছাড়া কেষ্ট মেলে না।

ফাণ্ড থেকে সর্বোচ্চ পরিমাণ ঋণ চাইতে গিয়ে ভারত সরকার যে 'ফেরে পড়েছেন তার সঙ্গে এই শ্রেণীস্বার্থের প্রসঙ্গটি জড়িত। ঘরপোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়, কিন্তু সে-গোরু যদি দু-কান কাটা হয় তা হ'লে পায় না। ১৯৬৬ সালে প্রথমবার প্রধান মন্ত্রী হয়ে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি ব্যাঙ্কের কাছ থেকে অঢেল দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণের পূর্বশর্ত হিশেবে ফাণ্ডের অনুজ্ঞা-অনুযায়ী ভারতীয় মুদ্রার মূল্য এক ধাক্কায় ৩৭ শতাংশ কমাতে রাজি হয়েছিলেন, ফল ভয়াবহ হয়েছিল, কারণ পাশাপাশি আরো শর্ত ছিল ব্যবসায়ীদের-শিল্পপতিদের

-তথা ধনিককুল সবাইকে উদারভাবে বিদেশ থেকে যত খুশি জিনিশ আমদানি করতে দিতে হবে ; সেই বিস্ফারিত আমদানির চাপে বাণিজ্যিক ঘাটতি ক'মে না-গিয়ে আরো বেড়ে যায়। চ'ড়ে-যাওয়া দামে বিদেশী জিনিশ আমাদের অর্থ-ব্যবস্থায় অনুপ্রবেশের ফলে মূল্যমান তীব্র ঊর্ধ্বগতি হয়, দেশের কোনো সমস্যারই নিরসন হয় না, শুধু গরিবদের ধকল বাড়ে, বড়োলোকশ্রেণীর লাভের বহর সেই সঙ্গে। তার পরের পনেরো বছরে জাতীয় আর্থিক সংকট বহুগুণ ঘনীভূত হয়েছে। ১৯৮০ সালে শ্রীমতী গান্ধীর প্রধানমন্ত্রিত্বে প্রত্যাবর্তনের পর থেকে সংকট প্রায় ক্রান্তিশিখরে পৌঁছেছে। দেশের বেশিরভাগ মানুষকে সম্পত্তি ও সুযোগ থেকে বিচ্যুত রেখে মুষ্টিমেয় কয়েকজন জাতীয় অর্থব্যবস্থার রসটুকু নিংড়ে নিতে চাইছেন। দেশের অধিকাংশ মানুষকে উৎপাদন-উপার্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখলে জাতীয় বিকাশ সম্ভব নয়, তাই অবরুদ্ধ অর্থব্যবস্থা। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধির প্রচ্ছায়ায় যাঁরা এরই মধ্যে রাষ্ট্রশক্তি আঁকড়ে আছেন, তাঁদের লোভের সীমা-পরিসীমা নেই, তাঁরা সরকারকে ব্যবহার করছেন কতটা কম সময়ে কতটা বেশি আখের গুছোনো যায় সেই একমুখী উদ্দেশ্যে। নিজেদের জন্য তাঁরা যথেচ্ছ অনুদান নিচ্ছেন। ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা তছনছ ক'রে নিজেদের জন্য তাঁরা অঢেল টাকার সুবিধা ক'রে নিচ্ছেন, সরকারি নির্দেশে প্রত্যেকটি নিত্যপ্রয়োজনীয় তথা মৌলিক দ্রব্যপণ্যাদির মূল্য বাড়িয়ে নিজেদের লাভের মাত্রা স্ফীততর করছেন। সেই সঙ্গে বিশ্ব ব্যাঙ্কের পরামর্শ শিরোধার্য ক'রে উৎপাদনব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল ক'রে নিয়ে বিদেশ থেকে অপরিমেয় জিনিশপত্র আমদানির উদ্যোগ করেছেন ; এমনকি দেশে যে-যে যন্ত্রপাতিকলকব্জা প্রচুর উৎপাদনের ক্ষমতা আছে, ভারত সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক বেপরোয়া সে-সমস্ত সরঞ্জাম পর্যন্ত বিদেশ থেকে আনাবার ব্যবস্থা করেছেন। সরকারের টাকায় বিদেশ থেকে আমদানির একটা বাড়তি সুবিধা : দুর্নীতি এখন রাষ্ট্র-কাঠামোর রন্ধ্রে-রন্ধ্রে প্রবিষ্ট, যে-কোনো আমদানি থেকে অন্যূন শতকরা পাঁচ-সাত শতাংশ কমিশন পাওয়া যেতে পারে ; পাঁচ হাজার কোটি টাকার জিনিশ আমদানি করলে তা থেকেই তো তিনশো-চারশো কোটি টাকা প্রতি বছর গোপন উপার্জনের ব্যবস্থা হ'তে পারে।

এই পরিস্থিতিতে যা হবার তা-ই হয়েছে, জিনিশপত্রের দাম লাগামছাড়া, কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে বিস্ফারিত ঘাটতি, সেই সঙ্গে, স্বভাবতই, বহির্বাণিজ্যের অঙ্কেও ভয়ংকর ঘাটতি। আয়ত্তের বাইরে যাওয়ার মতো অবস্থা। উপায়ান্তর

না-দেখে এই সরকার এখন আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে চাইছেন। চুপিচুপি গত ছ' মাসে ভারতীয় মুদ্রার বৈদেশিক মূল্য তাঁরা শতকরা ১৮ ভাগ কমিয়ে দিয়েছেন; ধর্মঘট নিষিদ্ধ করেছেন; বিনা-বিচারে আটক আইন পুনঃপ্রবর্তন করেছেন; শ্রমিকদের বোনাসের অধিকার খর্ব করেছেন; বিদেশী পুঁজিকে যথেষ্ট অনুপ্রবেশের অনুমতি দিয়েছেন। আগে থেকেই ফাণ্ডের তুষ্টিবিধানের এত-এত আয়োজন ক'রে এখন পায়ে মাথা খুঁড়ে মরছেন: দয়া করুন, অমোদের দেশের লোক জানতে পারলে ক্ষেপে যাবে, তার আগে চট ক'রে আমাদের সাড়ে পাঁচ হাজার কোটি টাকা ঋণের ব্যবস্থা ক'রে দিন, শর্তগুলি বলুন, আমরা দাসখৎ সই ক'রে দিয়ে কাজ হাসিল ক'রে তারপর লোকসভা-রাজ্যসভায় বলবো কী-কী শর্তে এই অর্থ সংগ্রহ করতে পেরেছি, সেই শর্তগুলি যত কঠিনই হোক একবার যদি সই হয়ে যায়, লোকসভা-রাজ্যসভায় আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে, দেশের মানুষ ক্ষেপে গেলেও আর বিশেষ-কিছু করতে পারবে না।

ভারত সরকারের দুর্ভাগ্য, দেশের-জাতির সৌভাগ্য, রাতের অন্ধকারে জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলির এই ষড়যন্ত্র ধরা প'ড়ে গেছে। দেশের সংবেদনশীল অর্থনীতিবিদরা প্রতিবাদ জানিয়েছেন, ফাণ্ডের পক্ষ থেকে ঋণদানের ব্যাপারে কোন্-কোন্ শর্তাবলী প্রস্তাব করা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে কোন্গুলি ভারত সরকার মেনে নিতে সম্মত হয়েছেন পূর্বাহ্ণে তা প্রকাশ করবার দাবি সারা দেশে সোচ্চারিত হয়েছে। ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার আগে শর্তাবলী প্রকাশ্যে উন্মোচন করার রেওয়াজ নেই, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর এই উক্তির অসারতা অন্য বেশ-কয়েকটি দেশের নজির দেখিয়ে খণ্ডন করা হয়েছে। তা ছাড়া, এটাও এখন সকলে জেনে গেছেন যে ঋণপত্রে সই করার পর যে-শর্তগুলি প্রকাশ করতে চাইছেন ভারত সরকার, তারও বাইরে আরো কিছু-কিছু গোপনতর, কঠিনতর শর্ত থাকতে পারে, যেগুলি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী একটি অপ্রকাশ্য প্রতিজ্ঞাপত্র ফাণ্ডের কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে মেনে নিতে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবেন। ভয়ংকর সেই অঙ্গীকারগুলির কথা ভারতবর্ষের জনসাধারণের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখার কোনো অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের নেই। আমাদের সরকার যদিও ঋণের শর্তগুলি প্রকাশ করতে রাজি হননি, অন্য-এক অনুন্নত দেশের প্রতিনিধি জনৈক ভারতীয় সাংবাদিকের কাছে এই ঘৃণ্য শর্তগুলির বিশদ বিবরণ ব্যক্ত করেছেন।

শ্রেণীস্বার্থের খাতিরে জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে ফাণ্ডের কৃপাভাণ্ড থেকে যত সহজে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ভেবেছিলেন ক্লেদাক্ত ঋণ সংগ্রহ ক'রে আনবেন, তেমনটি হচ্ছে না। দেশের মানুষের বিস্ফোটিত ক্ষোভের প্রকৃতি নিরীক্ষণ ক'রে কেন্দ্রীয় সরকার ঈষৎ বিচলিত; যে-আমলার দল রাতের অন্ধকারে ফাঁণ্ডের কাছে জাতীয় মর্যাদা বিকিয়ে দেওয়ার আয়োজন সম্পূর্ণ করছিল তারাও হতভম্ব, এখন নতুন ক'রে চুপিসারে ফাণ্ডের সঙ্গে আরেক দফা কথাবার্তা চলছে, জনরোষের কথা চিন্তা ক'রে শর্তাবলীর নিগড় সামান্য-একটু শিথিল করা সম্ভব কিনা তা নিয়ে অনুনয়-উপরোধ চলছে। অন্যদিকে, নবসাম্রাজ্যবাদীরা রক্তের আস্বাদ পেয়েছে, সত্তর কোটি মানুষের দেশ ভারতবর্ষকে পরাজিত-পর্যুদস্ত করবার এমন স্বর্ণসুযোগ তারা খোয়াতে রাজি নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের নায়কত্বে তারা চাইছে শর্তগুলি যেন আরো কঠিন করা হয়, ভারতবর্ষের আর্থিক স্বনির্ভরতার সম্ভাবনা এই সুযোগে যেন সম্পূর্ণ বিনষ্ট ক'রে দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হয়, ভারতবর্ষের শিরদাঁড়া যেন ভেঙে দেওয়া সম্ভব হয়।

এখানেই আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ড থেকে প্রস্তাবিত ঋণ গ্রহণের গুরুত্ব; আমাদের সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়ানো। আপাতত রাষ্ট্রশক্তি দখল ক'রে আছে উচ্চবিত্তভুক্ত দুর্নীতিসর্বস্ব মুষ্টিমেয় যে-ক'জন, তারা যাতে দেশটাকে অতর্কিতে নবউপনিবেশবাদীদের হাতে সমর্পণ না-করতে পারে, তার জন্য অতন্দ্র প্রহরা প্রয়োজন। এই প্রহরার ব্যবস্থা বামপন্থীদেরই করতে হবে।

হবেও বা

তেত্রিশ বছর আগে দেশ স্বাধীনতা পেয়েছে,কিন্তু কিছু-কিছু ভূত জুড়েই আছে।

নতুন শব্দ শেখা হচ্ছে, নতুন লব্জ। সাম্রাজ্যবাদের আপদ বিদায় হয়েছে, এখন নবসাম্রাজ্যবাদ। ঔপনিবেশিকতাবাদ নয়, নবঔপনিবেশিকতাবাদ। ভালো, নতুন-নতুন শব্দ শিখছি আমরা, কিন্তু আসল ব্যাপারে তেমন হেরফের হচ্ছে কি? তেত্রিশ বছর আগে দেশ স্বাধীন হয়েছিল, মস্ত ঢাক-ঢোল পিটিয়ে আঠাশ বছর আগে আর্থিক পরিকল্পনার সূত্রপাত করা হলো। দারিদ্র্য দূর হবে, নিরক্ষরতা দূর হবে, কৃষিতে-শিল্পে-বাণিজ্যে ঝলমল করবে দেশ, জাতি হিশেবে আমরা ক্রমশ স্বনির্ভর হ'তে শিখবো, বিদেশী মূলধন তথা বিদেশী প্রজ্ঞার উপর আর ভরসা ক'রে থাকতে হবে না, সবুর করো-না দুটো দিন।

দুটো দিন নয়, স্বাধীনতার পর পুরো তেত্রিশ বছর প্রতীক্ষা করা হয়েছে, প্রায় যে-তিমিরে সেই তিমিরেই আছি, ঠায় দাঁড়িয়ে। পরিকল্পনার নামে ফি পাঁচ বছর সেই পুরোনো রচনাগুলিই নতুন ক'রে ফের লেখা হচ্ছে। এখন আর পাঁচ বছরও অপেক্ষা করতে হচ্ছে না, কেন্দ্রে যেই সরকার বদল হচ্ছে, নতুন ক'রে আরেক দফা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। হুবহু ছেলেবেলায় পড়া, ওয়াজেদ আলির সেই 'ভারতবর্ষ' গল্পের মতো।

স্বনির্ভরতা একরত্তি বাড়েনি, এখনো তাই যে-কোনো প্রকারে – একে দাদা ডেকে ওকে ভাই ব'লে, একে-ওকে-তাকে-সবাইকে অঢেল ভরতুকি দিয়ে – বিদেশে জিনিশ পাঠানো হচ্ছে, রপ্তানি, রপ্তানি, রপ্তানি, রপ্তানি না-করতে পারলে বিদেশী মুদ্রা অর্জিত হবে না, এবং তা না-হ'লে বিদেশ থেকে আমদানি বন্ধ, কী গতি হবে তা হ'লে আমাদের? আরেকটি গল্পের কথা মনে প'ড়ে গেল : সোমনাথ লাহিড়ীর '১৯৪৪ সাল'। যে-ক'রেই হোক কন্ট্রাক্টটা যোগাড় করতেই হবে, শেষ পর্যন্ত তাই ঠিকাদার নিজের স্ত্রীকেই সায়েবের কাছে উৎকোচ হিশেবে জমা দিয়ে এলো। আমাদের প্রায় সেরকম গতি। ঘটি-বাটি বেচো, মান-সম্ভ্রম বেচো, বড়োলোকদের-পুঁজিপতিদের, ফাটকাবাজ-ব্যবসাদারদের,

বিদেশী ফড়েদের ঘুষ দাও, ভাঁই-ভাঁই ঘুষ দাও, ঘুষ দিয়ে রপ্তানি করো, তা দিয়ে বিদেশ থেকে জিনিশ আনার খোরাকি সংগ্রহ করো। বিদেশ থেকে জিনিশ না-আনলে জীবন ব্যর্থ, জাতি ব্যর্থ, ভবিষ্যৎ ঘোর অন্ধকার।

নতুন লজ্জ শিখছি, নতুন প্রথায় দীক্ষিত হচ্ছি। লজ্জা কী আমাদের, কোনো বিশেষ দেশ তো আমাদের উপরে ছড়ি ঘোরাচ্ছে না, ইংল্যাণ্ড নয়, মার্কিন নয়, জর্মানী নয়, ফরাশি নয়, ছড়ি ঘোরাচ্ছে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, বিশ্ব ব্যাঙ্ক, বিশ্ব ব্যাঙ্ক আমাদের দুঃখে গ'লে নদী হচ্ছে। ঘাবড়াচ্ছি কেন আমরা? এ তো আলাদা ক'রে কোনো বিদেশী শক্তি আমাদের উপর খবরদারি করছে না, এ তো বিশ্ব ব্যাঙ্ক গো, এতে মার্কিন-ইংরেজ-ফরাশি সবাই আছে যদিও, আন্তর্জাতিক ব্যাপার এটা, স্থতরাং এই ব্যাঙ্কের কথা শুনতে বাধা কোথায়, তা ছাড়া কেমন ভালো এই ব্যাঙ্কটা, না-চাইতে টাকার বন্যায় আমাদের ভাসিয়ে দিচ্ছে।

তাই কি?

নতুন লজ্জ শিখছি। সাম্রাজ্যবাদ খারাপ ছিল, কিন্তু নবসাম্রাজ্যবাদ তেমন খারাপ নয়। একা তো কেউ আমাদের ধ'রে পেটাচ্ছে না, আটটা-দশটা ধনতান্ত্রিক দেশ এক সঙ্গে মিলে আমাদের পেটাচ্ছে, আন্তর্জাতিক কায়দায়, আমরা তো তা হ'লে রবীন্দ্রনাথের গানের কলির ঢঙে বললেই পারি: এমনি ক'রে আমায় মারো?

১৯৪৬ সালে বিশ্ব ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আমাদের স্বাধীনতাপ্রাপ্তিরও এক বছর আগে। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, স্থলে ভুল নেই কিন্তু, সেই ১৯৪৬ সাল থেকে এই ১৯৮০ সাল পর্যন্ত চৌতিরিশ বছরে এই ব্যাঙ্কের সভাপতি কিন্তু কোনো-না-কোনো মার্কিন ভদ্দরলোকই থেকে গেছেন। ভদ্দরলোকদের কোনো বিষয়েই নড়চড় হয় না, স্থতরাং আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক, তা হোক-না কেন, ১৯৪৬ সালেও মার্কিন প্রধান, ১৯৫৬ সালেও তাই, ১৯৬৬ সালেও, এবং ১৯৮০ সালেও: তুমি আমাদের পিতা, তোমাকে পিতা ব'লে যেন জানি, নত হয়ে যেন মানি, তুমি কোরো না কোরো না রোষ।

কিন্তু, হয়তো বলা হবে তা হোকগে, টাকা কিন্তু দিচ্ছে আমাদের অনেক, দেদার টাকা, সেচের জন্য দিচ্ছে, সারের জন্য দিচ্ছে, কলকাতাকে তকতকে-ঝকঝকে করবার জন্য দিচ্ছে, বিদ্যুৎব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর জন্য দিচ্ছে, রেলগাড়ির জন্য দিচ্ছে। ডজন-ডজন সায়েবরা আসছে, আমরা ভজনা করছি,

খানা খাওয়াচ্ছি, ওঁদের সামনে হাত কচলাচ্ছি, ওঁরা ফিরে গিয়ে আমাদের কোটি-কোটি টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছেন, বিশ্ব ব্যাঙ্কের এই-সব মানুষগুলি কিন্তু ভারি ভালো, এত-এত টাকা আমাদের পৌঁছে দিচ্ছেন, গড় হ'য়ে প্রণাম করো।

না-হয় করলুম গড় হয়ে প্রণাম, কিন্তু সত্যিই কি বিশ্ব ব্যাঙ্ক আমাদের ঢেলে টাকা দিচ্ছে, কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা, কোটি-কোটি টাকা, প্রায় না-চাইতেই দিয়ে দিচ্ছে, একবারে মেঘ-না-চাইতে জলের মতো ব্যাপার? একটু কি আমরা খুঁটিয়েও দেখবো না আসল বস্তুটি কী?

যা মনে হয় অনেক ক্ষেত্রেই তো তা নয়। বিশ্ব ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রেও ওই একই রকম। আমরা একটি রাজ্য সরকার চালাচ্ছি, কলকাতার জন্যই হোক, কি সেচের জন্যই হোক, কি বিদ্যুতের জন্যই হোক, বিশ্ব ব্যাঙ্কের কাছ থেকে আমরা কিন্তু একটা কাণাকড়িও পেয়ে থাকি না। আসলে ব্যাঙ্ক থেকে যতটুকু আসছে তার পুরোটাই পাচ্ছেন কেন্দ্রীয় সরকার, আমরা নিমিত্ত মাত্র। ধরা যাক বিশ্ব ব্যাঙ্কের সায়েবরা সুন্দরবন ঘুরে গেছেন, এবং ব'লে গেছেন সুন্দরবনে একটা ইন্দ্রপুরী তৈরি করা হোক। বিশ্ব ব্যাঙ্ক ফতোয়া দিয়েছে, ভারত সরকার বশংবদ, চোখ-চকচক, সঙ্গে-সঙ্গে ফতোয়া পাঠালেন রাজ্য সরকারকে, বিশ্ব ব্যাঙ্ক থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে, কালবিলম্ব না-ক'রে প্রকল্প তৈরি হোক। প্রকল্পের জন্য খরচ, হিশেব ক'রে দেখা গেল, প্রায় একশো কোটি টাকায় দাঁড়াবে। বিশ্ব ব্যাঙ্ক তার বড়োজোর অর্ধেকটা—পঞ্চাশ কোটি টাকা—বিদেশী মুদ্রায় ভারত সরকারকে ধার দেবে। সাধু, সাধু, ধন্যি-ধন্যি প'ড়ে যাবে চারদিকে, বিশ্ব ব্যাঙ্ক দরাজ হাতে সুন্দরবনে ইন্দ্রপুরী তৈরি করবার জন্য পঞ্চাশ কোটি টাকা ধার দিয়েছে, এবার রাজ্য সরকার কোমর বেঁধে লাগুক।

কিন্তু কোমর বেঁধে লাগবো যে আমরা, টাকা কোথায় পাবো? ইন্দ্রপুরী গড়বার জন্য পুরো টাকাটা নয়, বড়োজোর অর্ধেকটা টাকা বিশ্ব ব্যাঙ্ক ঋণ দিয়েছে ভারত সরকারকে। আমরা তো টাকা পাইনি, একটা পয়সাও পাইনি বিশ্ব ব্যাঙ্কের কাছ থেকে। একশো কোটি টাকা খরচ করতে হবে রাজ্য সরকারকে, আমাদের গরিব দেশের গরিব মানুষগুলির উপর ট্যাক্সো চাপিয়ে টাকাটার ব্যবস্থা করতে হবে অথচ বাজারে র'টে গেছে বিশ্ব ব্যাঙ্ক ইন্দ্রপুরী তৈরি করছে, একশো কোটি টাকার ইন্দ্রপুরী!

তিন বছর আগে পর্যন্ত অবস্থা এ-ই ছিল: প্রকল্পটি বিশ্ব ব্যাঙ্কের, তাদের মর্জিমতো ছক-কাটা হতো, প্ল্যান তৈরি হতো। ফোপরদালালি করতেন বিশ্ব

ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিরা, দশ হাজার মাইল তিন মাস অন্তর-অন্তর উড়ে এসে, অথচ পুরো টাকাটা আমাদের রাজ্য সরকারের, রাজ্যের সাধারণ মানুষের। খাসা ব্যবস্থা, অবাক-করলি-রাম ব্যবস্থা, তবে কি এটাই নবঔপনিবেশিকতাবাদ? তা হবেও বা, শোনাচ্ছে ভালো।

তিন বছর আগে একটু অদল-বদল হলো, কারণ সম্ভবত চক্ষুলজ্জা। একশো কোটি টাকার প্রকল্প, তার মধ্যে বড়োজোর পঞ্চাশ কোটি টাকা বিশ্ব ব্যাঙ্ক ভারত সরকারকে ডলারে ধার দিচ্ছে, ভারত সরকার দিশী মুদ্রায় ওই পঞ্চাশ কোটির শতকরা সত্তর ভাগ, অর্থাৎ পঁয়তিরিশ কোটি টাকা, ধার দেবে রাজ্য সরকারকে। অর্থাৎ কিনা ইন্দ্রপুরী গড়ার জন্য প্রয়োজন একশো কোটি টাকার, পঁয়ষট্টি কোটি টাকার দায়ভার পুরোপুরি আমাদের, বাকি পঁয়তিরিশ কোটি টাকা ভারত সরকার চড়া হারে আমাদের ধার দিয়ে কৃতার্থ করবেন।

বাজারে কিন্তু রটবে বিশ্ব ব্যাঙ্ক আমাদের জন্য ইন্দ্রপুরী তৈরি করে দিচ্ছে। বিশ্ব ব্যাঙ্কের লোকেরা আসবেন। আমরা হাত কচলে আপ্যায়ন জানাবো, তাঁদের নির্দেশ মেনে নিজেদের ধন্য মনে করবো, আমাদের ধনে তাঁরা পোদ্দারি ক'রে যাবেন, আমরা বিচলিতবোধ করবো, পরস্পরকে বলবো: ভাগ্যিস বিশ্ব ব্যাঙ্ক ছিল, তাই এই ইন্দ্রপুরী তৈরি হ'তে পারলো।

হবেও বা।

সংকটের স্বরূপ

আর্থিক সংকট তো রাজনৈতিক সংকট থেকে আলাদা নয়, তারা পরস্পরের প্রতিবিম্ব—এবং পরিপূরক। এই সোজা সত্যটি সম্প্রতি আমরা যে-অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে গেছি, যাচ্ছি, তা থেকে প্রাঞ্জলতম হয়েছে, হচ্ছে।

রাজনীতি ক্ষমতাদখলের লড়াই। কোন্ শ্রেণী রাষ্ট্রশাসনের অধিকার পাবে, রাজনীতির সমস্ত আরক্ত সংগ্রাম সেই প্রশ্ন জড়িয়ে। ক্ষমতা হাতে পেলে, সেই ক্ষমতা ব্যবহার করা হবে নিজের শ্রেণীর স্বার্থে; ক্ষমতা হাতে পেয়ে আমরা নিজেদের শ্রেণীর কোলে ঝোল টানবো, তাই তো রাজনীতির লক্ষ্য। প্রশাসনিক ক্ষমতা, আইন প্রণয়ন-ও-প্রয়োগের ক্ষমতা, আর্থিক ক্ষমতা—কার উপর কর চাপিয়ে সরকারি তহবিলে টাকা আদায় করবো এবং তারপর কার জন্য সেই টাকা খরচ করবো—এ-সমস্ত কিছু নিয়েই রাজনীতি, যা কিনা অর্থনীতিও। অর্থনীতি মানেই শ্রেণীসংগ্রাম। শ্রেণীযুদ্ধ-নিরপেক্ষ কথা অর্থশাস্ত্রে নেই, থাকতে পারে না।

গোটা মানব-ইতিহাস এই শ্রেণীযুদ্ধের কথাই বলে। কোন্ শ্রেণী অপর কোন্ শ্রেণী বা কোন্-কোন্ শ্রেণীকে শোষণ ক'রে নিজেদের আখের গুছিয়েছে, ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করছে। শাসনযন্ত্র দখল ক'রে সরকারি সমস্ত সুযোগ-সুবিধা নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ বিস্তারে ব্যবহার করা হয়েছে, অপরাপর শ্রেণীর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করতে প্রয়োগ করা হয়েছে, দেশ-জাতি-সময়ের তফাতে কিছু হেরফের হয়নি, ইতিহাসের এই ধ্রুব সত্য অটুট-অব্যয় থেকেছে। অবশ্য ইতিহাসের সারাৎসার কখনো-কখনো নিংড়ে নিতে হয়; শ্রেণীস্বার্থের অঙ্গুলি হেলনে অনেক সময় সোজা সত্যটি একটু ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে ব্যক্ত করাটা প্রয়োজন হয়ে পড়ে; যাঁর অনুজ্ঞায় ইতিহাস লেখা হচ্ছে তিনি তো এটা চাইবেন না যে তাঁকে রক্তশোষক ব'লে আখ্যাত করা হোক, পরম অত্যাচারী জমিদারও নিজের নাতি-নাতনীর কাছে স্নেহের সাগর, ভালোবাসার আকর। তা সত্ত্বেও, দেশে-দেশে পৃথিবীর ইতিহাস কিন্তু শ্রেণীযুদ্ধের ইতিহাসই হয়ে থাকে।

আমাদের দেশেও স্বাধীনতা-উত্তরকালে যা ঘটেছে, ঘটছে, তা পুরোটাই শ্রেণীশোষণ-শ্রেণীসংগ্রাম। জমিদার-ধনী কৃষক - বড়ো পুঁজিপতি - শাঁসালো ব্যবসাদারদের দল ছিল জাতীয় কংগ্রেস, তাদের হাতে ইংরেজরা ১৯৪৭ সালে শাসনক্ষমতা তুলে দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হলো। শাসনক্ষমতা মানে রাষ্ট্রযন্ত্রের অধিকার, সেই অধিকার পরমানন্দে জাতীয় কংগ্রেস স্বকীয় শ্রেণীস্বার্থে ব্যবহার ক'রে এসেছে। প্রথম দিকে তেমন-কোনো অসুবিধা ছিল না: একটা-দুটো অঞ্চল বাদ দিয়ে সমাজচেতনা জনমানসে প্রায় শূন্য। দেশের বেশির ভাগ মানুষ নিরক্ষর, বড়োলোকেরা মা-বাপ, তারা-রাখলে-বাঁচবো, তারা-মারলে-মুখ-বুজে-মরবো — এ-ধরনের চিন্তার সমাচ্ছন্নতা। তা ছাড়া, কংগ্রেস খুব রগরগে একটি বটিকা দেশ-সুদ্ধ লোককে খাওয়াতে পেরেছিল : কে বলেছে আমাদের দলটা বড়োলোকদের স্বার্থ দেখে, দ্যাখো-না কেন ঝুঁকে প'ড়ে, আমরা কী রকম ভালো-ভালো প্রবন্ধ লিখছি, দেশে আমরা সমাজতন্ত্র কায়েম করবো, গরিবদের কত-কত ভালো হবে, তাদের ছেলেমেয়েরা সবাই লেখাপড়া শিখবে, তারা স্বাস্থ্যমণ্ডিত হবে, সব রকম সুযোগ-সুবিধা পাবে, আমাদের সব-কিছু উদ্যোগ ও আয়োজন তো তাদেরই জন্য। ইত্যাদি কথার মোহিনীমায়ায় অন্তত কিছু মানুষকে কংগ্রেস ভুলিয়ে রাখতে পেরেছিল অনেক দিন ধ'রে।

কথার সঙ্গে কাজের ফারাক অবশ্যই দুস্তর। এটা না-হ'লেই অবাক হ'তে হতো। শ্রেণীস্বার্থ শ্রেণীস্বার্থই, তাকে যে-ক'রেই হোক, ক্ষমতা যখন হাতে এসেছে, প্রসারিত করতে হবে। সুতরাং আইন প্রয়োগ করো বড়োলোকের স্বার্থে, প্রশাসনকে ব্যবহার করো জমিদার-জোতদার-শিল্পপতি-অসাধু ফাটকাবাজদের স্বার্থে, সরকারি আর্থিক বিধিবিধান-নির্দেশাদিতে উচ্চবিত্তদের যেন সতত পোয়া-বারো হয়, এবং গরিবরা উত্তরোত্তর যেন আরো বেশি মুশকিলে পড়ে। এই সামগ্রিক নীতির ফলশ্রুতি হিশেবে তিরিশ বছর জুড়ে ভূমিসংস্কার আটকে রাখা হয়েছে, শিল্পে ব্যক্তিগত মালিকানার অবাধ প্রসার ঘটতে দেওয়া হয়েছে, বিদেশী মূলধনকে চোখ টিপে নতুন সুভঙ্গ দিয়ে পুনরামন্ত্রণ জানানো হয়েছে, প্রত্যক্ষ করের বোঝা নামমাত্র ক'রে পরোক্ষ করের বোঝা একটা ভয়ংকর পর্যায়ে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সরকারি প্রসাদে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিশপত্রের দাম ঋতুতে-অঋতুতে প্রতিনিয়ত বাড়ানো হয়েছে। সমাজের দারিদ্র্যতরদের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-সর্ববিধ সুযোগ-সুবিধার অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে, গরিবদের শোষণ ক'রে সংগৃহীত রাজস্ব জমিদার, জোতদার, শিল্পমালিক, ব্যবসাদারদের অঢেল

অনুদানের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হয়েছে, তাতে না-কুলোলে নোট ছাপিয়ে অনুদানের বাড়তি ব্যবস্থা করা হয়েছে, যার ফলে জিনিশপত্রের দাম আরো বেড়েছে, গরিবরা আরো মারা পড়েছে। এই অবস্থার বিরুদ্ধে একটু-একটু ক'রে গোটা দেশের শ্রমজীবী-কর্মজীবী মানুষ যখন প্রতিবাদে সংহত হ'তে শুরু করেছে তখনই দমনপীড়নের রথঘর্ঘর শোনা গেছে, বিনা বিচারে আটক আইন প্রণয়ন করা হয়েছে, লাঠি-গুলি চলেছে, যারা সত্যিকারের দেশপ্রেমিক—দেশের খেটে-খাওয়া মানুষের জন্য যাদের প্রাণ উৎসর্গীকৃত—তাদের দেশদ্রোহী আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছে, গোটা দেশ জুড়ে সন্ত্রাস-নিপীড়নের ঝড় বইয়ে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু এত-সব ক'রেও ইতিহাসের নিয়মের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না। শাসককুল ক্রমশ নিজেদের স্ববিরোধের জালে আরো বেশি ক'রে জড়িয়ে গেছেন, যাচ্ছেন। উপরতলার আমরা দুই-চার শতাংশ যারা আছি, শুধু তারাই আখের গোছাবো, পয়মন্ত হবো, সুযোগ-সুবিধা-সম্পত্তি অন্য কারো সঙ্গে ভাগ ক'রে নেবো না: এই নীতির পরিণাম ভয়ংকর। ভূমিসংস্কারে বাধা দেওয়া হয়েছে, তার মানে অধিকাংশ কৃষিজীবী জমির অধিকার থেকে বঞ্চিত; সেই সঙ্গে সেচের জলের অধিকার থেকে, সরকারি ও ব্যাঙ্ক ঋণ লাভের অধিকার থেকে, উন্নত বীজ-শস্য থেকে, নতুন-নতুন কৃষি-প্রকরণে দীক্ষিত হবার অধিকার থেকে। কৃষিজীবী মানুষের অধিকাংশ মানেই তো সমগ্র দেশের জনসংখ্যার মস্ত বড়ো অংশ: এই এত-এত কোটি মানুষ উৎপাদন-উপার্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। তাই এক-দিকে যেমন কৃষি-উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটেনি, শিল্প-বাণিজ্য-ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও সেই গ্লানির ছায়া পড়েছে। এত বড়ো দেশ, সম্ভাবনায় ভরপুর, সত্তর কোটি লোক, কিন্তু লোকগুলিকে গরিব ক'রে রাখা হয়েছে, দু-মুঠো অন্নের সংস্থানই সমস্যা, শিল্পজাত জিনিশ তারা কিনবে কী ক'রে? তাই জিনিশপত্রের চাহিদা নেই, কলকারখানার প্রসার নেই, ব্যবসা-বাণিজ্যও এক জায়গায় থমকে দাঁড়ানো। নতুন-নতুন কলকারখানা খোলা হ'লে লোকের কাজ জুটতো সেখানে, ভালো-মন্দ মাইনেপত্তর পেতো তারা, সেই মাইনেপত্তর ফের বাজারে জিনিশ-পাতি কিনতে খরচ হতো, চাহিদা আরো বাড়তো, আরো-আরো উৎপাদন প্রসারের দরকার পড়তো, তা হ'লে আরো-আরো দোকান-পত্তর, কর্মসংস্থান আরো বাড়তো, চকমকে-ঝকঝকে হতো দেশটা। কিন্তু, শাসককুল সেটা হ'তে দেবেন না, তাদের তাৎক্ষণিক স্বার্থে আঘাত পড়বে তাতে। অতএব সংকট, অতএব উন্নতিহীন নিরানন্দ দেশ, অতএব দারিদ্র্য।

কিন্তু যদি অর্থব্যবস্থার প্রসার না ঘটে, বড়োলোকেরা লাভ লুটবে কী ক'রে তা হ'লে? পুঁজিপতিরা? জমিদার-জোতদাররা? রাঘব-বোয়াল ব্যবসাদারেরা? তাদের কী উপায় হবে? শ্রেণীস্বার্থই কি শ্রেণীস্বার্থের পায়ে কুড়ুল মারবে? উপস্থিত মুহূর্তে এই সর্বনাশ প্রতিকারের হাতের কাছে একটাই মাত্র উপায়, অতএব সেটা প্রয়োগ করা হয়। সমস্ত জিনিশপত্রের যথেচ্ছ দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয়; উৎপাদন না বাড়ুক, দাম বাড়িয়ে বাড়তি লাভ ঘরে তোলা যাক, দাম বাড়ালে গরিবদের সর্বনাশ, বড়োলোকদের পৌষ মাস। তাছাড়া, ভেবে-চিন্তে, মুনাফা টিঁকিয়ে রাখার আরো একটি পন্থা উদ্ভাবন করা হোক। দেশের সত্তর কোটি মানুষের বেশির ভাগেরই কেনবার সংগতি নেই, কী দরকার তাদের কথা ভেবে, এসো, বিদেশে জিনিশ বিক্রি করা যাক। বিদেশে জিনিশ বিক্রি ক'রে কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা উপার্জনের সুখস্বপ্নে শাসককুল বুঁদ হয়ে আসেন। যে-ক'রেই হোক, বিদেশে জিনিশ চালান করতেই হবে, দরকার হ'লে অনুদান দেওয়া হবে, মন্ত্রের সাধন কি শরীর পাতন, নাকি মনে নেই সেই গান্ধিজি যে বলেছিলেন, করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে, সেরকম অঙ্গীকারে দীক্ষিত হয়ে বিদেশে জিনিশ রপ্তানি করতে হবে, বিদেশে যাতে ঝটপট জিনিশপত্র বিক্রি হ'তে পারে তার জন্য ব্যবসাদারকে-শিল্পপতিকে-জমিদারকে মুঠো-মুঠো টাকা অনুদান দেওয়া হবে, হাতে টাকা পেয়ে শ্রেণীস্বার্থের তাগিদ তারা ভালোমতোই বুঝবে।

কিন্তু ফলে সংকট আরো ঘনীভূত হয়। জিনিশপত্রের দাম বাড়ে, অথচ সাধারণ মানুষের আয় বাড়ে না; সুতরাং বিক্ষোভ বাড়ে, বেতন-ভাতা বাড়াবার দাবি বাড়ে, যার কিছুটা মানতেই হয়। অতএব উৎপাদনের খরচও আর-এক দফা বাড়ে, জিনিশপত্রের দাম তাই আরো চড়ে, বিক্ষোভও চড়ে সেই সঙ্গে আর-এক মাত্রা। আর যদি দাম বাড়ানো না হয়, বড়োলোকদের লাভের বহরে তা হ'লে টান পড়ে, যা থেকে আর-এক সংকট। অন্যদিকে জিনিশপত্রের দাম বেড়ে যাওয়ার ফলে সরকারের আয়-ব্যয়ের সমতা ব্যাহত হয়; সুতরাং হয় বাড়তি কর চাপাতে হয়, নয় আরো বেশি-বেশি নোট ছাপাবার দরকার হয়ে পড়ে। বড়োলোকদের উপর তো আর কর বসানো চলে না, তাই পরোক্ষ করের বোঝাটা গরিব মানুষের উপর আরো ভারী হয়, তাতে বিক্ষোভ আরো পুঞ্জীভূত হয়। অন্যদিকে নোট-ছাপানোরও একই পরিণতি; বাজারে দাম আরো চড়ে, সাধারণ মানুষের মেজাজও। তাছাড়া, বিদেশী জিনিশ বিক্রি ক'রে লাভ অটুট রাখার জন্য প্রয়োজন যে-অনুদান, তা-ও তো

সরকারকেই জোগাতে হয়, তার জন্য ফের প্রয়োজন হয় আর-এক দফা পরোক্ষ কর বাড়ানোর, নয়তো আর-এক দফা নোট-ছাপানোর। এবং দেশের আভ্যন্তরীণ মূল্যমান যতই উর্ধ্বগতি হয়, অনুদানের পরিমাণও ততই বিস্তারিততর হ'তে-হ'তে চলে, সুতরাং কর চাপিয়ে দাম-বাড়ানোর, নয়তো নোট ছাপিয়ে দাম-বাড়ানোর তাগিদও তত বাড়ে।

বুভুক্ষু সাধারণ মানুষগুলি, নিরক্ষর সাধারণ মানুষগুলি, মূল্যস্ফীতির ফলে ভ্যাবাচ্যাকা-খাওয়া মানুষগুলি, আস্তে-আস্তে চিন্তা করতে শেখে, চিন্তার বিন্যাসে তারা পরস্পরের কাছে জড়ো হয়, আস্তে-আস্তে জোট বাঁধে তারা। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময়ে আমরা জনতার সেই সংহত রুদ্রমূর্তি একবার প্রত্যক্ষ করেছিলাম। শাসককুল, শাসককুলের সরকার, শাসককুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সেই মূর্তি দেখে বেসামাল। লাঠিসোঁটা, বন্দুক-গুলি, মেশিনগান, গুপ্তচর-গুপ্তঘাতক দিয়ে তা চূর্ণ করবার চরম চেষ্টায় নিজেদের তাঁরা উৎসর্গীকৃত করেন; জরুরি অবস্থা, সমস্ত রকমের অধিকার কেড়ে নেওয়ার বিঘোষণা, কিন্তু লাঠি-সোঁটা-গুলি-কামান-বন্দুক-গুপ্তচর-গুণ্ডাবাহিনী এ-সব-কিছুর জন্যও তো অঢেল অর্থের প্রয়োজন, যার জন্য ফের সাধারণ লোকের উপর কর চাপাতে হয়, নোট ছাপাতে হয়। সংকটের গণ্ডি থেকে পরিত্রাণ তাই অসম্ভব।

শাসককুলের বিভঙ্গগুলি বদলায় না, মাত্র আট বছর বাদে একই কাহিনী আমরা পুনরাবৃত্ত হ'তে দেখছি। ইন্দিরা গান্ধির সরকার দাঁড়িয়ে থেকে সমস্ত জিনিশপত্রের দাম বাড়াচ্ছেন, অনুদানের পর অনুদানের উপচার সাজিয়ে বিদেশে রপ্তানির চেষ্টা ক'রে যাচ্ছেন, বড়োলোকেরা যাতে উৎপাদন সামান্যতমও বাড়ান তার জন্য সমস্ত নিয়ম-নীতি বিধিনিষেধ শিথিল ক'রে দিচ্ছেন, এমনকি পায়ে ধ'রে বিদেশীদের ডেকে নিয়ে আসছেন, ভারতবর্ষে এসো, বিনিয়োগ করো, তোমাদের দ্বারা ধর্ষিত-শোষিত হ'তে আমরা সদাপ্রস্তুত সদাসম্মত; বিদেশী অর্থপ্রতিষ্ঠানাদির কাছ থেকে ন্যক্কারজনক শর্তে অর্থ ভিক্ষা করা হচ্ছে, আমাদের উদ্ধার করো, আমরা গোটা পৃথিবীর শোষণকারী মানুষের স্বার্থ দেখছি, আমরা গরিব মানুষদের মেরে ঠাণ্ডা ক'রে দেওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করেছি, কালো কানুন ফিরিয়ে এনেছি, ধর্মঘট নিষিদ্ধ করেছি, বোনাসের অধিকার কেড়ে নিয়েছি।

কিন্তু সংকট ঘনীভূত হচ্ছেই, হবেই। সত্তর কোটি মানুষের স্থস্থিত ক্রয়-ক্ষমতার বিকল্প ব্যবস্থা এলোপাথাড়ি অনুদানের-ঘুষ-দেওয়া রপ্তানি হ'তে পারে

না, এবং অমুদানের ব্যবস্থা করতে গিয়ে সংকট আরো গভীরতর হবে। বিদেশী-দের ছিঁটেফোঁটা করুণার দানে সে-সংকটের আগুন প্রশমিত হবার নয়। মনে হয় শাসককুলও সেটা বুঝে গেছেন; তাঁদের মানসিকতা অনেকটাই অন্ত-ভক্ষ্য-ধনুর্গুণ গোছের। সংকটের হাত থেকে অব্যাহতি নেই, জনতা ক্রমশ জাগ্রত, ক্রমশই তাদের জঙ্গী চেহারা। অতএব এলোমেলো ক'রে দিয়েছেন মা, যে-ক'টা দিন হাতে আছে, এসো, লুটেপুটে খাই। দাম বাড়িয়ে লুটি, কর ফাঁকি দিয়ে লুটি, সরকারি অর্থ অনুদান হিশেবে নিষ্কাশন ক'রে লুটি, এবং শাদামাটা অতি সরল অর্থে যে-ধরনের আক্ষরিক অর্থে লুট, সে-ধরনের লুটি।

যেমন দৃষ্টান্তিত করেছেন মহারাষ্ট্রে আবদুর রহমান আন্তুলে। কী দরকার ঢাক-ঢাক গুড়গুড়ের, এসো, প্রকাশ্যে লুটি, আমরা শাসককুল, আমাদের শ্রেণী-স্বার্থ আমরা না-দেখলে কে দেখবে। পশ্চিম বঙ্গের শিল্পোৎপাদনের জন্য অতি-প্রয়োজন সারাৎসার আন্তুলে মহাশয় উৎকোচ চেয়ে, উৎকোচ পেয়ে, উৎকোচ গ্রহণ ক'রে শৌণ্ডিকদের কাছে বিক্রি করেছিলেন, ফলে শিল্পে-শিল্পে সুরাসারের অভাবহেতু উৎপাদন স্তব্ধ হলো, বহু শ্রমিক কর্মহীন হ'য়ে পড়লো। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে মহার্ঘ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় ক'রে বিদেশ থেকে সারাৎসার আমদানি ক'রে পশ্চিম বঙ্গের সমস্যা মেটাবার জন্য উদ্যোগ নিতে হলো। উৎপাদন নয়, উৎকোচ-শোষণ, আবদুর রহমান আন্তুলে-কথিত এই বাণীনির্ঝরেই জাতীয় অর্থসংকটের সারাৎসার নিহিত।